কর্ম-রহস্য

॥ শ্রীহরিঃ ॥

কর্ম-রহস্য

পুরুষ ও প্রকৃতি—এই দুটি আছে। এই দুইয়ের মধ্যে পুরুষে কখনও পরিবর্তন হয় না। আর প্রকৃতি কখনও পরিবর্তনরহিত হয় না। যখন এই পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে তখন প্রকৃতির ক্রিয়া পুরুষের 'কর্ম' হয়ে দাঁড়ায় কারণ প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করলে তাদাত্ম্য ঘটে যায়। তাদাত্ম্য হয়ে গেলে যেসব প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ পাওয়া যায় তাতে মমত্ব এসে যায় এবং সেই মমতার দরুণ অপ্রাপ্ত বস্তুরও কামনা জাগে। এইভাবে যতদিন পর্যন্ত কামনা, মমতা ও তাদাত্ম্য থাকে, ততদিন যা কিছু পরিবর্তনরূপ ক্রিয়া ঘটতে থাকে, সেগুলির নাম 'কর্ম'।

তাদাত্ম্য ভঙ্গ হলে সেই কর্মই পুরুষের কাছে 'অকর্ম' হয়ে যায় অর্থাৎ সেই কর্ম ক্রিয়ামাত্র হয়ে দাঁড়ায়। তাতে ফলজনকতা বা ফলোৎপাদন কিছু থাকে না—এই হল 'কর্মে অকর্ম'। অকর্ম অবস্থায় অর্থাৎ স্বরূপের অনুভব হলে সেই মহাপুরুষের শরীরের দ্বারা যা কিছু ক্রিয়া হয়ে চলে, তাই হল 'অকর্মে কর্ম'। যেমন গীতায় বলা হয়েছে—

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥ (গীতা ৪।১৮)

এর তাৎপর্য হল যে আপন নির্লিপ্ত স্বরূপের অনুভব না হলেও বাস্তবে সব ক্রিয়াই প্রকৃতি এবং তার কার্য পরিণামরূপ শরীরেই ঘটে থাকে। কিন্তু প্রকৃতি বা শরীর থেকে নিজেকে আলাদা বলে বোধ না হওয়ার দরুণ ঐ ক্রিয়াসমূহ 'কর্ম' হয়ে দাঁড়ায়—

।। শ্রীহরিঃ ।।

সূচীপত্র

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥ (গীতা ৩।২৭)
প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি॥ (গীতা ১৩।২৭)

কর্ম তিনরকম—ক্রিয়মাণ, সঞ্চিত ও প্রারব্ধ। এখন বর্তমানে যে কর্ম করা হচ্ছে, তার নাম 'ক্রিয়মাণ' কর্ম *। বর্তমানের আগে এই জন্মেই যা কিছু করা হয়েছে, অথবা আগের অনেক মনুষ্য জন্মে করা হয়েছে যে-সব কর্ম, যা সংগৃহীত হয়ে আছে, তাকে বলা হয় 'সঞ্চিত' কর্ম। আবার ঐ সঞ্চিতের মধ্যে যে-কর্ম ফলদানের জন্য প্রস্তুত অর্থাৎ উন্মুখ হয়ে আছে অর্থাৎ জন্ম, আয়ু এবং অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিরূপে পরিণত হবার জন্য সামনে এসে গিয়েছে, সেগুলিকে বলা হয় 'প্রারব্ধ' ।
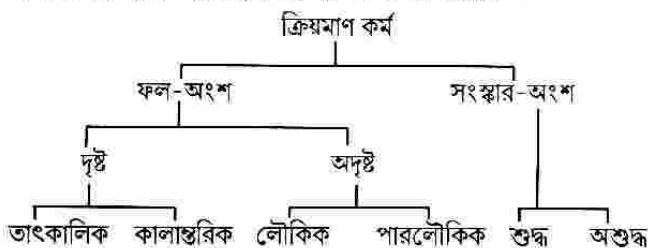
ক্রিয়মাণ কর্ম দুরকমের হয়ে থাকে—শুভ এবং অশুভ। যে কর্ম শাস্ত্র অনুসারে বিধি-বিধানপূর্বক করা হয়ে থাকে, তাদের শুভ কর্ম বলে আর কাম, ক্রোধ, লোভ, আসক্তি প্রভৃতি অবলম্বনে যে শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম করা হয়, তাদের বলে অশুভ কর্ম।

শুভ এবং অশুভ প্রত্যেক ক্রিয়মাণ কর্মের একটি হয় ফল-অংশ এবং আর এক হয় সংস্কার অংশ। এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন।

* যেসব নতুন কর্ম এবং তার সংস্কার সৃষ্ট হয় সেসব কেবল মনুষ্যজন্মেই সৃষ্ট হয়ে থাকে (গীতা ৪।১২, ১৫।২)। পশু-পক্ষী আদি যোনিতে নয়, তার কারণ এই সব যোনি কেবল কর্মফল ভোগের জন্যই প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

ক্রিয়মাণ কর্মের ফল অংশের দুটি ভেদ—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। এর মধ্যে আবার দৃষ্টেরও আছে দুটি ভেদ—তাৎকালিক ও কালান্তরিক। যেমন, ভোজন করার সময় যে রস পাওয়া যায়, সুখ লাভ হয়, প্রসন্নতা দেখা দেয়, তৃপ্তি হয়—এ সব হল দৃষ্টের 'তাৎকালিক' ফল। আর ভোজনের পরিণামস্বরূপ যে আয়ু, বল, আরোগ্য ইত্যাদির বৃদ্ধি—এ হল দৃষ্টের 'কালান্তরিক' ফল। ঠিক তেমনি যার বেশি ঝাল খাওয়ার অভ্যাস সে যখন বেশি ঝাল দেওয়া কিছু খায়, তখন তার প্রসন্নতা বা সুখ লাভ হয় আর সেই সঙ্গে ঝাল বেশি হওয়ার দরুণ মুখে, জিভে জ্বালা দেখা দেয়। নাক-চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে, মাথা থেকে ঘাম ঝরে—এ সব হল দৃষ্টের 'তাৎকালিক' ফল। কুপথ্যের ফলে পরিণামে যে পেটে জ্বালা ও রোগ, দুঃখাদি দেখা দেয়—এগুলি হল দৃষ্টের 'কালান্তরিক' ফল।

ঠিক তেমনিই অদৃষ্টেরও দুটি ভেদ আছে— লৌকিক এবং পারলৌকিক। বেঁচে থাকতে থাকতেই যাতে ফল মিলে যায় এই ভাব নিয়ে যজ্ঞ, দান, তপ, তীর্থ, ব্রত, মন্ত্রজপাদি শুভ কর্ম যদি বিধি-বিধান অনুসারে করা হয় এবং তার কোন প্রবল প্রতিবন্ধক বা বাধা না দেখা দেয়, তা হলে এখানেই অর্থাৎ এ জীবনেই পুত্র, ধন, যশ, প্রতিষ্ঠাদি অনুকূল সব কিছুর প্রাপ্তি এবং রোগ, দারিদ্র্য প্রভৃতি প্রতিকূল সব কিছুর নিবৃত্তি ঘটে যাওয়া—এ হল অদৃষ্টের 'লৌকিক' ফল।† আর মরণের পরে যাতে স্বর্গাদি প্রাপ্তি ঘটে, সেই ভাব বা উদ্দেশ্য নিয়ে যথার্থ বিধি-বিধান অনুসারে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-পূর্বক যজ্ঞ, দান, তপ ইত্যাদি শুভ কর্ম যদি করা যায় তা হলে মরণের অনন্তর স্বর্গাদি লোক যে লাভ হয়—তা হল অদৃষ্টের 'পারলৌকিক' ফল। তেমনি চুরি, ডাকাতি, মানুষকে হত্যা করা প্রভৃতি অশুভ কর্মের ফলে

†এখানে দৃষ্টের 'কালান্তরিক' ফল এবং অদৃষ্টের 'লৌকিক' ফল—দুই ফলই সমান বলে প্রতীত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেটি 'কালান্তরিক' ফল তা সোজাসুজিই মিলে থাকে, প্রারব্ধ হয়ে নয়। কিন্তু যা 'লৌকিক' ফল, তা প্রারব্ধ হয়েই লাভ হয়ে থাকে।

এখানেই অর্থাৎ এ জন্মেই যে জেল, জরিমানা, ফাঁসি ইত্যাদি হওয়া, তা হল অদৃষ্টের 'লৌকিক' ফল। আর পাপের ফলে মরণের পর নরকগমন এবং পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদিতে পরিণত হওয়া—তা সব হল অদৃষ্টের 'পারলৌকিক' ফল।

পাপ-পুণ্যের এই লৌকিক ও পারলৌকিক ফলের বিষয়ে আর একটি কথাও বুঝবার আছে। তা হল এই যে, যে-সব পাপকর্মের ফল জেল, জরিমানা, নিন্দা, অপমান ইত্যাদি রূপে এখানেই ভোগ করা হয়ে গিয়েছে, সেইসব পাপের ফল আর মরণের পরে ভোগ করতে হয় না। কিন্তু মানুষটির পাপের মাত্রা বা পরিমাণ কতটা ছিল এবং তার ভোগই বা কতটা কী পরিমাণে কমে গেল অর্থাৎ সেই পাপকর্মের ফল সে পুরোই ভুগে গেল বা কিছু বাকি রেখে গেল—এর পুরো হিসাব মানুষের অগোচরই থেকে যায়, কারণ মানুষের কাছে এর হিসাব-নিকাশ কিছু নেই বা থাকে না। কিন্তু ভগবানের কাছে এর সবটাই জানা। সেইজন্য তাঁর আইন অনুসারে সেই পাপের ফল যতটা অংশে কম ভুগে গিয়েছে, ততটা এই জন্মে বা মরণের পরে তাকে ভুগতেই হবে। এইজন্য মানুষের পক্ষে কখনও এরকম আক্ষেপ করা উচিত নয় যে আমার তো পাপ কম ছিল কিন্তু তার জন্য এত বেশি দণ্ড ভুগতে হল অথবা আমি তো পাপ করিনি, তবু আমার ঘাড়ে এই দণ্ড কেন ? তার কারণ হল সর্বজ্ঞ, সর্বসুহৃদ, সর্বসমর্থ ভগবানের এমনই নিখুঁত বিধান যে পাপের বেশি বা অতিরিক্ত দণ্ড কেউ ভোগ করে না আর যে দণ্ড মেলে তা কোন না কোন পাপেরই ফলে মিলে থাকে অর্থাৎ নিরপরাধ বা নিষ্পাপ কাউকে তিনি দণ্ড দেন না কখনও।*

---

*একটি শোনা ঘটনা। কোন এক গ্রামে একজন ভালো লোক থাকতেন। তাঁর বাড়ীর সামনেই এক স্বর্ণকারের বাড়ী ছিল। স্বর্ণকারের কাছে সোনা আসত এবং সে তা থেকে নানারকম গয়না গড়ে দিত। এইভাবে সে পয়সা রোজগার করত। একদিন তার কাছে অনেক সোনা জমা হয়ে গেল। রাত্রে যে পাহারা দিত সেই সেপাই এ খবর জেনে গেল। সেই পাহারাদার সেই স্বর্ণকারকে রাত্রিকালে মেরে

ঠিক তেমনি ধন-সম্পত্তি, মান-সম্মান, সমাদর, প্রশংসা, নীরোগ সুস্থ জীবন ইত্যাদি অনুকূল পরিস্থিতিরূপে পুণ্য কর্মের যত ফল এখানে ভোগ

ফেলল এবং যে বাক্সে সোনা ছিল, সেটি তুলে নিয়ে চলে গেল। ইতিমধ্যে সামনে থাকতেন যে ভদ্রলোক তিনি প্রস্রাব করতে উঠে এলেন বাইরে। তিনি পাহারাদারকে ধরে ফেলে বললেন যে, 'তুই এই বাক্স নিয়ে যাচ্ছিস্ কী বলে ?' তাকে পাহারাদার বলল—'তুই চুপ্ কর, চেঁচামেচি করিস্ না, এর থেকে কিছু তুই নিয়ে নে, আর কিছু আমি নিয়ে নিই।' ভদ্রলোক বললেন—'আমি কী বলে নিয়ে নেব ? আমি থোড়াই তোমার মতো চোর।' পাহারাদার বলল—'দেখ্, ভালো করে বুঝে ভেবে দেখ্, আমার কথা মেনে নে, নইলে তোর কপালে দুঃখ আছে।' কিন্তু সেই ভদ্রলোক রাজী হলেন না, মানলেন না তার কথা। তখন পাহারাদার করল কী, সেই বাক্সটি নীচে রেখে দিল এবং সেই ভদ্রলোকটিকে পাকড়ে ধরে জোরে হুইসিল্ বাজিয়ে দিল। সেই হুইসিল্ শুনতেই আর সব জায়গায় যেসব পাহারাদারেরা ছিল তারা দৌড়ে চলে এল। সে তখন তাদের সবাইকে বলল—'এই লোকটা এই বাড়ী থেকে বাক্স বার করে এনেছে, আমি ওকে পাক্ড়াও করেছি, ধরে ফেলেছি।' তারপর সব সেপাইরা ঘরে ঢুকে দেখল যে স্বর্ণকার মরে পড়ে আছে। তখন তারা সেই ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করে সরকারী লোকদের হাতে তুলে দিল। জজের সামনে তর্কাতর্কি হল, তাতে সেই ভদ্রলোকটি বললেন—'আমি একে মারিনি, এই পাহারাদার সেপাইই মেরেছে।' সব সেপাইরা পরস্পর মিলিত, একদলেরই লোক, তারা বলল—'না, না, এই মেরেছে, আমি নিজে রাত্রে একে গ্রেপ্তার করেছি' ইত্যাদি।

মোকদ্দমা চলল। চলতে চলতে শেষে সেই ভদ্রলোকের ফাঁসির হুকুম হল। ফাঁসির হুকুম হতেই সেই ভদ্রলোকের মুখ থেকে বেরিয়ে এল—'দেখো, কী খোলাখুলি অন্যায় হতে চলেছে। ভগবানের রাজ্যে কী ন্যায় বলে কিছু নেই ? আমি মারিনি, আমার হল দণ্ড, আর যে মেরেছে সে বেকসুর খালাস পেয়ে যায়, কোন জরিমানাও দিতে হয় না তাকে, এ এক ঘোর অন্যায়।' তার এই কথায় জজের মন প্রভাবিত হল, তিনি বুঝলেন যে বাস্তবে এই লোকটিই সত্য কথা বলছে। এর যে কোন উপায়ে যাচাই হওয়া দরকার। এইরকম চিন্তা করে জজ এক

করা হল এজন্মে, সেই অংশ তো নষ্ট বা ক্ষয় হয়েই গেল, আর যতটা বাকি রয়ে গেল, তা পরলোকে গিয়ে ভোগ করা যেতে পারে। যদি পুণ্যকর্মের সম্পূর্ণ ফল এখানেই ভোগ করে নিয়ে থাকে, তা হলে তার পুণ্য এখানেই সব শেষ হয়ে গিয়েছে বুঝতে হবে।

ক্রিয়মাণ কর্মের সংস্কার অংশেরও আর দুটি ভেদ আছে—শুদ্ধ এবং পবিত্র সংস্কার আর অশুদ্ধ এবং অপবিত্র সংস্কার। শাস্ত্রবিহিত কর্ম করার

কৌশল অবলম্বন করলেন।

সকাল হতেই একজন লোক কাঁদতে কাঁদতে ও চিৎকার করতে করতে এল এবং বলল—'আমার ভাই খুন হয়েছে, জজ সাহেব ! এর অনুসন্ধানপূর্বক নির্ধারণ হওয়া দরকার।' তখন এই শুনে জজ সেই সেপাই এবং কয়েদী ভদ্রলোককে সেই মৃত ব্যক্তির লাসটি তুলে আনবার জন্য পাঠালেন। দুজনেই সেই লোকটির সঙ্গে সেখানে গেলেন, যেখানে লাশ পড়ে ছিল। খাটের উপর লাশটি একটি চাদর দিয়ে ঢাকা ছিল, রক্তও ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ছিল ইতস্ততঃ। দুজনে খাটটিকে তুলল এবং তুলে নিয়ে চলল। সঙ্গের দ্বিতীয় লোকটি খবর দেবার ছুতোয় দৌড়ে এগিয়ে গেল। তখন যেতে যেতে সেপাইটি কয়েদীকে বলল—'দেখ্, সেদিন তুই যদি আমার কথা মেনে নিতিস্, তা হলে সোনা মিলে যেত এবং ফাঁসিও হত না, এখন দেখলি তো সত্য নিষ্ঠার ফল ?' কয়েদী তখন বলল—'আমি তো নিজের কাজ সত্য অনুসারেই করেছি, ফাঁসি হয়ে গিয়েছে তো কি হয়েছে ! হত্যা বা খুন করলি তুই, আর দণ্ড ভুগতে হল আমাকে ! ভগবানের রাজ্যে ন্যায় বলে কিছু নেই !'

খাটের উপর মরার মত পড়ে ছিল যে লোকটি, সে দুজনের এই কথাবার্তা শুনছিল। যখন জজের সামনে খাটটি এনে রাখা হল, তখন রক্তমাখা কাপড়টি সরিয়ে সে উঠে বসল এবং সব কথা জজকে জানিয়ে দিল যে রাস্তায় সেপাই এই বলছিল এবং কয়েদী এই বলেছিল। এই শুনে জজ বড় আশ্চর্য হয়ে গেলেন। সেপাইটিও হকচকিয়ে গেল। তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কয়েদ করা হল। কিন্তু জজের মনে তবু সন্তুষ্টি এল না। তিনি কয়েদীকে অর্থাৎ সেই ভদ্রলোককে একান্তে ডেকে বললেন—'এই মামলায় তুমি যে নির্দোষ, তা আমি মানছি কিন্তু ঠিক ঠিক

ফলে যে সংস্কার বা ছাপ পড়ে, সেগুলি শুদ্ধ এবং পবিত্র হয়ে থাকে, আবার শাস্ত্র, নীতি, লোকমর্যাদার বিরুদ্ধ কর্ম করলে যে সংস্কার গৃহীত হয় তা হয় অশুদ্ধ ও অপবিত্র।

এই দুই অর্থাৎ শুদ্ধ ও অশুদ্ধ সংস্কার নিয়েই মানুষের স্বভাব, প্রকৃতি গঠিত হয়ে থাকে। এই সংস্কারসমূহের মধ্য থেকে অশুদ্ধ অংশের সর্বথা নাশ করার ফলে স্বভাব শুদ্ধ, নির্মল, পবিত্র হয়ে যায়। কিন্তু যে সব পূর্বকৃত

বলো তো এই জন্মে তুমি কোন হত্যা করেছ কী কখনও ?' সে বলল—'অনেক কাল আগের কথা। এক দুষ্ট দুশ্চরিত্র লোক ছিল, যে লুকিয়ে-চুরিয়ে আমার বাড়ীতে আমার স্ত্রীর কাছে আসত। আমি আমার স্ত্রীকে এবং তাকেও আলাদা-আলাদাভাবে অনেক বুঝিয়েছিলাম কিন্তু তারা আমার কথা মানেনি। এক রাত্রে সে আমার বাড়ীতে তখন ছিল, আমি হঠাৎ এসে পড়েছি। আমার তখন মাথায় রাগ চেপে গিয়েছিল। আমি তলোয়ার দিয়ে তার গলা কেটে ফেললাম এবং বাড়ীর পিছনে যে নদী ছিল তাতে তাকে ফেলে দিলাম। এই ঘটনার কথা আর কেউই জানতে পারেনি।' এই শুনে জজ তখন বললেন—'তোমার এই সময় ফাঁসি হবেই। আমিও ভাবছিলাম যে আমি কারুর কাছে কখনো ঘুষ খাইনি, কারুর সঙ্গে বেঈমানী করিনি, তাহলে আমার হাত দিয়ে নিরপরাধ, এর ফাঁসির হুকুম লেখা হল কেমন করে ? এখন আমার মন সন্তুষ্ট হল। সেই পাপের ফল তোমাকে এখন ভুগতে হবে। সেপাইয়ের আলাদা ফাঁসি হবে।'

(সেই ভদ্রলোক চোর সেপাইকে ধরে আপন-কর্তব্য পালন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁকে যে দণ্ড ভোগ করতে হল, সেটা তাঁর কর্তব্য-পালনের ফল নয়, বরং অনেক আগে যে-হত্যা তিনি করেছিলেন, সেই হত্যারই ফল। কারণ, মানুষের অধিকার আছে নিজেকে রক্ষা করার, মারবার বা হত্যা করার অধিকার নেই। মারবার অধিকার রক্ষক ক্ষত্রিয়ের, রাজার আছে। সেইজন্য কর্তব্য-পালন করার দরুণ সেই পাপ (হত্যা)র ফল সে এখানেই পেয়ে গেল এবং পরলোকের ভয়ঙ্কর দণ্ড থেকে সে নিষ্কৃতি লাভ করল। তার কারণ এই যে, ইহলোকে যে দণ্ড ভোগ করা হয়ে যায়, তাতে অল্পের উপর দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ হয়, অল্পেই শুদ্ধি ঘটে যায়, নইলে পরলোকে বড় ভয়ঙ্কর, সুদসমেত দণ্ড ভোগ করতে হয়।)

কর্মের দ্বারা স্বভাব গঠিত হয়, সেই কর্মগুলির ভিন্নতার দরুণ জীবন্মুক্ত পুরুষদের স্বভাবেও নানা ভেদ থেকে যায়। এই স্বভাবের বিভিন্নতার কারণেই তাঁদের দ্বারা বিভিন্ন রকমের কর্ম হতে দেখা যায় কিন্তু সে-সব কর্ম দোষযুক্ত হয় না। সর্বথা শুদ্ধই হয়ে থাকে এবং সেই সব কর্মের দ্বারা জগতের কল্যাণ সাধিত হয়।

সংস্কার অংশ থেকে যে স্বভাব নির্মিত হয় তা এক দৃষ্টিতে মহা প্রবল হয়ে থাকে তাই বলা হয় 'স্বভাবো মূর্ধ্নি বর্ততে' অর্থাৎ স্বভাব সকলের মাথার উপরে। অতএব তাকে ঘোচানো যায় না। যেমন বলা হয়েছে—

ব্যাঘ্রস্তুষ্যতি কাননে সুগহনাং সিংহো গুহাং সেবতে
হংসো বাঞ্ছতি পদ্মিনীং কুসুমিতাং গৃধ্রঃ শ্মশানে স্থলে।
সাধুঃ সৎকৃতিসাধুমেব ভজতে নীচোঽপি নীচং জনং
যা যস্য প্রকৃতিঃ স্বভাবজনিতা কেনাপি ন ত্যজ্যতে॥

অর্থাৎ ব্যাঘ্র ঘন বনে সন্তুষ্ট থাকে, সিংহ গুহায় আশ্রয় নেয়, হংস চায় প্রস্ফুটিত কমলিনী, শকুনী শ্মশানস্থল, সাধু সদাচারী সৎ মানুষের মধ্যেই থাকতে চান, নীচ প্রকৃতির লোক চায় নীচ জনকে। যার যেমন প্রকৃতি স্বভাব থেকে জন্মায়, সেই প্রকৃতি কেউ ছাড়তে চায় না, এই হল সার কথা।

ঠিক তেমনিই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের যে স্বভাব তাতে কর্ম করারই

এই কাহিনী থেকে এটা বোঝা যায় যে মানুষের কবে করা পাপের ফল কবে মিলবে—তার কোন নিশ্চয় বা হদিশ নেই। ভগবানের বিধান বড় বিচিত্র। যতদিন পর্যন্ত পুরানো পুণ্য প্রবল থাকে ততদিন পর্যন্ত সেই পাপের ফলও তখন-তখনিই ফলে না। যখন পুরানো পুণ্য শেষ হয়ে যায়, তখন সেই পাপের পালা আসে। পাপের ফল বা দণ্ড তো ভুগতেই হয়, হয় এ-জন্মে বা জন্মান্তরে। তাই বলা হয়—

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্।
নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম জন্মকোটিশতৈরপি॥

অর্থাৎ অবশ্যই ভোগ করতে হবে যা কিছু করা হয়েছে কর্ম, শুভ বা অশুভ, ভালো বা মন্দ। ভোগ না হলে কোন কর্মই ক্ষয় বা বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, কোটিকোটি জন্মেও।

প্রাধান্য থাকে। সেইজন্য শ্রীভগবান অর্জুনকে বললেন যে তুমি যে কর্ম মোহবশত করতে চাইছ না, তাও তুমি স্বাভাবিক অর্থাৎ স্বভাবজাত কর্মে বদ্ধ হওয়ার দরুণ পরবশ বা পরাধীন হয়ে করতে বাধ্য হবে (গীতা ১৮।৬০)।

এখন এখানে একটি জিনিস ভাববার আছে—একদিকে তো স্বভাবের মহা প্রাবল্য, যাকে কেউ ত্যাগ বা অতিক্রম করতে পারে না। আবার অন্যদিকে মনুষ্য-জীবনে চেষ্টা বা উদ্যোগেরও কম প্রাধান্য নেই, যার দরুণ মানুষ সব কিছু করার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন। অতএব, এই দুইয়ের মধ্যে কার জয় হবে, কারই বা পরাজয় ? এতে জয়-পরাজয়ের কথা নেই। আপন-আপন স্থানে দুই-ই প্রবল। কিন্তু এখানে **'স্বভাবো নাতিরিচ্যতে'** অর্থাৎ স্বভাবকে ছাড়া যায় না বলে যে কথা আছে তা জাতি-বিশেষের স্বভাবের কথা। এর তাৎপর্য হল যে জীব যে বর্ণে বা জাতিতে জন্মেছে, তাতে তার উৎপাদক রজোবীর্য যেমন ছিল তদনুসারেই তার যে স্বভাব গঠিত হয়েছে, তা কেউ বদলাতে পারে না। অতএব সেই স্বভাব দোষী নয়, তা নির্দোষ।

যেমন ব্রাহ্মণ- ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের যে স্বভাব, সে স্বভাব বদলাতে পারে না এবং তা বদলাবার প্রয়োজনও নেই এবং শাস্ত্রও বলে না তাকে বদলাতে। কিন্তু সেই স্বভাবে যেটি অশুদ্ধ অংশ (রাগ-দ্বেষ) আছে, সেটিকে দূর করার সামর্থ্য ভগবান মানুষকে দিয়েছেন। অতএব যে দোষের ফলে মানুষের স্বভাব অশুদ্ধ হয়ে পড়েছে, সেইসব দোষকে ঘুচিয়ে মানুষ স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ নিজের স্বাধীন চেষ্টার দ্বারা আপন স্বভাবকে শুদ্ধ করে তুলতে পারে। মানুষ যদি চায়, তা হলে হয় কর্মযোগের দৃষ্টিতে নিজস্ব প্রচেষ্টায় রাগ-দ্বেষকে দূর করে স্বভাবকে শুদ্ধ করে নিতে পারে*, অথবা ভক্তিযোগের দৃষ্টিতে সর্বথা ভগবানের শরণ নিয়েও নিজ স্বভাবকে শুদ্ধ

*ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ।। (গীতা ৩।৩৪)

করতে পারে*। এইভাবে প্রকৃতি বা স্বভাবের প্রবলতাও সিদ্ধ হয়ে গেল এবং মানুষের স্বাতন্ত্র্যও সিদ্ধ হল। তাৎপর্য হল এই যে শুদ্ধ স্বভাবকে বজায় রাখার ব্যাপারে হল প্রকৃতির প্রাধান্য বা প্রাবল্য আর অশুদ্ধ স্বভাবকে দূর করার ব্যাপারে হল মানুষের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা।

যেমন লোহার তলোয়ারে যদি পরশপাথর ছোঁয়ানো যায়, তাহলে তলোয়ার সোনার হয়ে যায়। কিন্তু তার মার, ধার ও আকার—এ তিনটি বদলায় না। এইভাবে সোনা করে দেওয়ার ব্যাপারে প্রাধান্য রইল পরশ পাথরের। আর 'মার-ধার-আকার'-এ রইল তলোয়ারের প্রাধান্য। ঠিক তেমনিই যে সব মানুষেরা আপন স্বভাবকে পরম শুদ্ধ করে নিয়েছেন তাঁদের কর্মও সর্বথা শুদ্ধই হয়ে থাকে। কিন্তু তবুও স্বভাব শুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায়, সাধন-প্রক্রিয়া ইত্যাদি অনুসারে তাঁদের কর্মের মধ্যে পরস্পর ভেদ থেকেই যায়। যেমন, কোন ব্রাহ্মণের তত্ত্ববোধ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে নিজের খাওয়া-দাওয়াতে শুদ্ধতা, পবিত্রতা বজায় রেখেই চলবে এবং একমাত্র স্বপাকেই ভোজন করবে। কারণ তার স্বভাবেই এই পবিত্রতা আছে। কিন্তু কোন হরিজন বা সাধারণ বর্ণের মানুষের যদি তত্ত্বজ্ঞান হয়ে যায় তা হলেও সে খাওয়া-দাওয়াতে অত পবিত্রতা বজায় রাখতে যাবে না, অন্যের উচ্ছিষ্টও খেয়ে নেবে, তার কারণ তার স্বভাবই বা প্রকৃতিই সেইভাবে গড়ে উঠেছে। কিন্তু তার এই স্বভাব তার জন্য দোষী বলে বিবেচিত হবে না।

জীবের পক্ষে অসতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের প্রবণতা বা স্বভাব অনাদিকাল থেকেই হয়ে আছে। যার দরুণ সে জন্ম-মরণের এই চক্রে পড়ে বারবার উচ্চ-নীচ যোনিতে পরিভ্রমণ করছে। এই স্বভাবকে মানুষ শুদ্ধ করতে পারে অর্থাৎ তাতে তার যে কামনা, মমতা, তাদাত্ম্য বোধ আছে, সে সব দূর করতে পারে। কামনা, মমতা, একাত্মতা বা তাদাত্ম্য ঘুচে গেলে যে

*তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।। (গীতা ১৮।৬২)

স্বভাব থাকে, সে স্বভাব আর দোষের কারণ হয় না। সেইজন্য সেই স্বভাব তাকে ঘোচাতে হবে না এবং ঘোচানোর কোনও প্রয়োজনও নেই।

যখন মানুষ অহংকারের আশ্রয় ছেড়ে সর্বথা ভগবানের শরণ বা আশ্রয় নেয় তখন তার স্বভাব শুদ্ধ হয়ে যায়। যেমন, লোহা পরশপাথরের স্পর্শে খাঁটি সোনা হয়ে যায়। স্বভাব শুদ্ধ হয়ে গেলে পর সে স্বভাবজ কর্ম করতে থাকলেও দোষী বা পাপী বলে আর গণ্য হয় না (দ্রষ্টব্য: গীতা ১৮।৪৭)। সর্বথা ভগবানের শরণ গ্রহণের পর ভক্তের আর প্রকৃতির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকে না। তখন ভক্তের জীবনে ভগবানের স্বভাবই ক্রিয়া করে থাকে। ভগবান হলেন সমস্ত প্রাণীর সুহৃদ। একান্ত বন্ধু—**'সুহৃদং সর্বভূতানাম্'** (গীতা ৫।২৯)। তেমনিই ভক্তও সমস্ত প্রাণীদের সুহৃদ হয়ে থাকে—**'সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্'** (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৫।২১)।

ঠিক তেমনিই কর্মযোগের দৃষ্টিতে যখন মানুষ রাগ-দ্বেষকে দূর করতে সক্ষম হয় তখন তার স্বভাবের শুদ্ধি ঘটে যায়, যার ফলে আপন স্বার্থের ভাব দূর হয়ে কেবল দুনিয়ার হিত বা মঙ্গলের ভাব স্বতই জেগে ওঠে। ভগবানের স্বভাব যেমন প্রাণিমাত্রের হিতসাধন, ঠিক তেমনি তারও স্বভাব প্রাণিমাত্রের হিতকারক হয়ে যায়। যখন তার সব চেষ্টা প্রাণিমাত্রের হিতে নিয়োজিত হয়, তখন তার ভগবানের সর্বভূত মঙ্গলকারক শক্তির সঙ্গে একতা বা তাদাত্ম্য সম্পাদিত হয়ে যায়। তার সেই স্বভাবে তখন ভগবানের বন্ধুত্ব, সুহৃত্তা বা সৌহার্দ-শক্তি কাজ করতে থাকে।

বাস্তবে ভগবানের সেই সর্বভূতসুহৃত্তারূপ শক্তি মনুষ্যমাত্রের কাছে সমানভাবেই উন্মুক্ত হয়ে আছে। কিন্তু অহংকার ও রাগদ্বেষের দরুণ সেই শক্তিতে বাধা এসে পড়ে অর্থাৎ সেই শক্তি আর কাজ করে না। মহাপুরুষদের মধ্যে অহংকার অর্থাৎ নিজস্ব ব্যক্তিত্ববোধ আর রাগদ্বেষ থাকে না, সেইজন্য তাঁদের মধ্যে এই শক্তি কাজ করতে লেগে যায় অর্থাৎ সক্রিয় হয়।
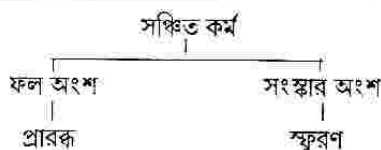
অনেক মনুষ্য-জন্মে সম্পাদিত যে সব কর্ম (ফল-অংশ এবং সংস্কা অংশরূপে) অন্তঃকরণে সংগৃহীত অর্থাৎ জমা হয়ে থাকে, তাদের বলে সঞ্চিত কর্ম। তার মধ্যে ফল অংশ থেকে তো 'প্রারব্ধে'র সৃষ্টি হয় আ সংস্কার অংশ থেকে 'স্ফুরণ' হতে থাকে। সেই স্ফুরণসমূহের মধ্যেও বর্তমানে করা হয়েছে যে সব নতুন ক্রিয়মাণ কর্ম, যা ঐ সঞ্চিতে নতুন জম হয়েছে, প্রায়শ সেইগুলিরই স্ফুরণ বা প্রকাশ ঘটে থাকে। কখনও কখনও সঞ্চিতে জমে থাকা পুরানো কর্মেরও স্ফুরণ ঘটে যায়*। যেমন, কোন পাত্রে যদি প্রথমে পেঁয়াজ ঢেলে দেওয়া হয় এবং তার উপর ক্রমে ক্রমে গম ছোলা, যব ঢেলে দেওয়া যায় তাহলে বাহির করার সময় সব চেয়ে প্রথম ঐ যবই বেরুবে, যা সব চেয়ে শেষে ঢালা হয়েছিল কিন্তু মাঝে মাঝে কখনো কখনো পেঁয়াজেরও উগ্র গন্ধ এসে যাবে তার মধ্যে। কিন্তু এই দৃষ্টান্ত পুরোপুরি খাটে না। তার কারণ হল পেঁয়াজ, গম ইত্যাদি হল সাবয়ব পদার্থ আর সঞ্চিত কর্ম হল নিরবয়ব অর্থাৎ যার আকার নেই। এই দৃষ্টান্ত কেবল এই অংশকে বোঝাবার জন্য এখানে দেওয়া হল যে নতুন ক্রিয়মাণ কর্মের

---

*স্ফুরণ অর্থাৎ প্রকাশ সঞ্চিতের অনুসারেও হয়, আবার প্রারব্ধের অনুসারেও হয়। সঞ্চিতের অনুসারে যে স্ফুরণ হয় তা মানুষকে কর্ম করতে বাধ্য করে না। কিন্তু সঞ্চিতের স্ফুরণেও যদি রাগ-দ্বেষ হয়ে যায়, তাহলে তা 'সংকল্প'রূপে পরিণত হয়ে মানুষকে কর্ম করতে বাধ্য করতে পারে। প্রারব্ধ অনুসারে যে স্ফুরণ হয়, তা ফল-ভোগ করাবার জন্য মানুষকে কর্ম করতে বাধ্য করে থাকে। কিন্তু তা বিহিত কর্ম করার জন্যই বাধ্য করে, নিষিদ্ধ কর্ম করার জন্য নয়। তার কারণ হল বিবেক-প্রধান মনুষ্যশরীর নিষিদ্ধ কর্ম করার জন্য নয়। অতএব আপন বিবেকশক্তিকে প্রবল অর্থাৎ বলশালী করে নিষিদ্ধকে ত্যাগ করার ভার মানুষের উপর ন্যস্ত আছে এবং তা করতে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

স্ফুরণই বেশি ঘটে থাকে আর কখনও কখনও পুরানো কর্মেরও স্ফুরণ ঘটে অর্থাৎ তারও গন্ধ পাওয়া যায়।

তেমনি আবার যখন নিদ্রা আসে, তখন তার মধ্যেও স্ফুরণ বা প্রকাশ ঘটে থাকে। নিদ্রাকালে জাগ্রত অবস্থা দাবিয়ে যাওয়ার ফলে অর্থাৎ চাপা পড়ার দরুণ সঞ্চিতের সেই স্ফুরণ বা প্রকাশ তখন স্বপ্নরূপে দেখা দিতে থাকে। একেই স্বপ্নাবস্থা বলা হয়।* স্বপ্নাবস্থায় বুদ্ধির খবরদারি না থাকার

*জাগ্রৎ অবস্থাতেও জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি—তিন অবস্থা হয়ে থাকে। যেমন মানুষ জাগ্রৎ-অবস্থায় খুব সাবধানতার সঙ্গে কাজ করে যখন, তখন এ হল জাগ্রতের জাগ্রৎ-অবস্থা। জাগ্রৎ-অবস্থায় যখন মানুষ যে কাজটি করে, সেই কাজটি ছাড়াও আকস্মিকভাবে অন্য কিছুর যে স্ফুরণ চিন্তনরূপ প্রকাশ হতে থাকে, এটি হল জাগ্রতে স্বপ্ন অবস্থা। জাগ্রৎ-অবস্থায় কাজ করতে করতে কখনও কখনও সেই কাজের এবং আগের কোন কাজের কোনরকম স্ফুরণই যখন হয় না, সম্পূর্ণ বৃত্তিরহিত অবস্থা এসে যায়, তখন সেটি হল জাগ্রতে সুষুপ্তি-অবস্থা।

কর্ম করার বেগ বা তীব্রতা বেশী হলে জাগ্রৎ-অবস্থায় জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থা বেশি করে দেখা দেয় কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থা খুব অল্প কদাচিৎ দেখা দেয়। যদি কোন সাধক জাগ্রতের স্বাভাবিক সুষুপ্তিকে স্থায়ী করে ফেলতে পারে তাহলে তার সাধন খুব তীব্র হয়ে উঠবে। কারণ জাগ্রৎ-সুষুপ্তিতে পরমাত্মার সঙ্গে নিরাবরণরূপে সাধকের স্বতঃ আপনা-আপনি সম্বন্ধ ঘটে যায়। এমনিও তো সুষুপ্তি অবস্থায় সংসারের সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে যায় কিন্তু বুদ্ধির বৃত্তি বা বুদ্ধির ক্রিয়া অজ্ঞানে লীন হয়ে যাওয়ার দরুণ স্বরূপের স্পষ্ট অনুভব বা উপলব্ধি ঘটে না। জাগ্রৎ-সুষুপ্তিতে বুদ্ধি জাগ্রত থাকার ফলে স্বরূপের স্পষ্ট অনুভব হতে থাকে।

এই জাগ্রৎ-সুষুপ্তি সমাধির চেয়েও বিলক্ষণ, কারণ এ স্বতঃ, আপনা-আপনি হয়ে থাকে আর সমাধিতে অভ্যাসের দ্বারা বৃত্তিসমূহকে একাগ্র ও নিরুদ্ধ করতে হয়। সেইজন্য সমাধিতে পুরুষার্থ অর্থাৎ নিজের চেষ্টা সঙ্গে থাকার দরুণ শরীরে স্থিতি হয়ে থাকে অর্থাৎ দেহাত্মবোধ থেকে যায়। কিন্তু জাগ্রৎ-সুষুপ্তিতে অভ্যাস ও অহংকার বিনাও অর্থাৎ চেষ্টা ছাড়াও সমস্ত বৃত্তি আপনা-আপনি নিরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার দরুণ স্বরূপে স্থিতি হয় অর্থাৎ স্বরূপের অনুভব হয়।

দরুণ সেখানে আর ক্রম, ব্যতিক্রম, অনুক্রম এ সবের বালাই থাকে না যেমন, শহর তো যেটি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তা হল দিল্লীর, অথচ বাজার দেখ যাচ্ছে বোম্বাইয়ের, আবার সেই বাজারে যে-সব দোকান দেখা যাচ্ছে, ত হল কোলকাতার ! তেমনি জীবিত মানুষকে স্বপ্নে দেখা যায়, আবার সেইসঙ্গে পরলোকগত কোন মানুষের সঙ্গে মিলন ঘটে যায়, কথাবার্তাও হয় ইত্যাদি, ইত্যাদি।

জাগ্রত অবস্থায় প্রত্যেক মানুষের মনে অনেকরকম স্ফুরণ, জ্ঞান বা বোধ ঘটতে থাকে, চলতেই থাকে। যখন জাগ্রত অবস্থায় দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের উপর থেকে বুদ্ধির অধিকার বা নিয়ন্ত্রণ সরে যায় বা চলে যায় তখন মানুষ যেমন যা মনে আসে, তাই বলতে শুরু করে। এইভাবে তখন তার উচিত-অনুচিতের বিচার করবার শক্তি কাজ না করার দরুণ তাকে সবাই 'সাদা-সীধে' অর্থাৎ 'সরল-পাগল' বলেই আখ্যাত বা চিহ্নিত করে। কিন্তু যার দেহ-ইন্দ্রিয়-মনের উপর অধিকার বা নিয়ন্ত্রণ থাকে, সে যা উচিত বলে বোঝে তাই বলে থাকে আর যা অনুচিত মনে করে তা আর বলে না। বুদ্ধি সাবধান অর্থাৎ সজাগ থাকার দরুণ সে নিজেও সজাগ, সচেতন থাকে, এইজন্য সে হল 'চতুর-পাগল'।

এইভাবে দেখতে গেলে মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবানকে প্রাপ্ত না হয় ততদিন পর্যন্ত সে আপন স্ফুরণসমূহ অর্থাৎ অনুভবের সমষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে না। ভগবৎপ্রাপ্তি হয়ে গেলে মন্দ বা খারাপ স্ফুরণগুলি সর্বথা তিরোহিত বা দূর হয়ে যায়। সেইজন্য জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের অপবিত্র মন্দ বিচার বা চিন্তা কখন আসেই না। যদি তাঁর যাকে দেহ বলা হয়, সেই শরীরে প্রারব্ধবশে, ব্যাধি ইত্যাদি কারণে বেহুঁশ, উন্মাদ ইত্যাদি অবস্থা এসেও যায়, তবুও সেই অবস্থায়ও না তিনি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কিছু বলেন আর না শাস্ত্রবিরুদ্ধ কিছু করেন, কারণ অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে শাস্ত্রনিষিদ্ধ কিছু বলা বা করা তাঁর আর স্বভাবেই থাকে না।

সঞ্চিতের মধ্য থেকে যে-কর্ম ফলদানের জন্য সম্মুখে এসে পড়ে সেইসব কর্মকে প্রারব্ধ কর্ম বলে (**'প্রকর্ষেণ আরব্ধঃ প্রারব্ধঃ'** অর্থাৎ ভালোমত ফল দেবার জন্য যার আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, তাই হল **'প্রারব্ধ'**)। প্রারব্ধ কর্মসমূহের ফল তো অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতিরূপে সামনে এসে উপস্থিত হয় ; কিন্তু সেই প্রারব্ধ কর্মগুলি ভোগের জন্য প্রাণিসমূহের প্রবৃত্তি তিনপ্রকারে হয়ে থাকে—(১) স্বেচ্ছাপূর্বক (২) অনিচ্ছা (দৈবেচ্ছা) পূর্বক এবং (৩) পরেচ্ছাপূর্বক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—

(১) কোন ব্যবসাদার মাল কিনল তো তাতে তার লাভ হয়ে গেল। তেমনিই আর এক ব্যাপারী মাল কিনল তো তাতে তার ঘাটতি বা ক্ষতি হয়ে গেল। এই দুইয়ের মধ্যে একজনের লাভ হওয়া এবং অন্যজনের ক্ষতি হওয়া তাদের শুভ-অশুভ কর্মের দ্বারা গঠিত প্রারব্ধের ফল কিন্তু মাল কেনার ব্যাপারে তাদের প্রবৃত্তি কিন্তু স্বেচ্ছাপূর্বক অর্থাৎ আপন ইচ্ছানুসারেই ঘটেছে।

(২) কোন এক ভদ্রলোক কোথাও যাচ্ছিলেন তো তাঁর সামনে যে নদী এসে পড়ল তাতে বন্যার দরুণ জলপ্রবাহে একটি টাকার পুঁটলি ভেসে এল এবং সেটি সেই লোকটি তুলে নিলেন। তেমনি আর একজন সজ্জন কোথাও যাচ্ছিলেন তো তাঁর মাথার উপর একটি গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ল আর তাঁর মাথায় চোট লাগল। এই দুইয়ের মধ্যে একজনের ধনলাভ, অন্যজনের আঘাতপ্রাপ্তি তো তাঁদের আপন-আপন শুভ-অশুভ কর্মের

দ্বারা সৃষ্ট প্রারব্ধেরই ফল। কিন্তু টাকার পুঁটলি পাওয়া এবং গাছের ডাল মাথায় ভেঙ্গে পড়া—এটি অনিচ্ছাপূর্বক অর্থাৎ দৈবেচ্ছাপূর্বকই সংঘটিত হয়েছে।

(৩) কোন একজন বড়লোক একটি শিশুকে দত্তকরূপে গ্রহণ করে নিলেন, অর্থাৎ তাকে পুত্ররূপে স্বীকার করে নিলেন, যার ফলে তাঁর সব ধনদৌলত সেই বাচ্চাটিই পেয়ে গেল। আবার তেমনি চোরেরা কারুর সব ধনদৌলত লুঠ করে নিয়ে গেল। এই দুইয়ের মধ্যে বাচ্চাটির ধনলাভ আর অন্যের চুরির ফলে ধনক্ষয়, এ তো উভয়ের শুভ-অশুভ কর্মসমূহের দ্বারা গঠিত প্রারব্ধের ফল কিন্তু দত্তক পোষ্যপুত্র হয়ে যাওয়া আর চুরি হয়ে যাওয়া—এই প্রবৃত্তি দুটি পরেচ্ছাপূর্বক অর্থাৎ অন্যের ইচ্ছার দরুণ ঘটেছে।

এখানে আর একটি জিনিসও বুঝে নেওয়া দরকার যে কর্মসমূহের ফল 'কর্ম' হয় না। যা হয় তা হল 'পরিস্থিতি' অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্মের ফল পরিস্থিতিরূপে সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়। যদি নতুন অর্থাৎ ক্রিয়মাণ কর্মকেও প্রারব্ধেরই ফলরূপে স্বীকার করা হয়, তা হলে তো 'এমন করো এমন করো না' এসব শাস্ত্রের, গুরুজনের বিধিনিষেধ, সবই নিরর্থক হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় কথা, আগে প্রথমে যেমন কর্ম করেছিল তদনুসারেই জন্ম হবে এবং তদনুসারেই কর্মও হবে তা হলে সেই সব কর্ম আবার পরে নতুন কর্মের সৃষ্টি করবে, যার ফলে এই কর্মের পরম্পরা অর্থাৎ ধারাপ্রবাহ চলতেই থাকবে অর্থাৎ তার কখনোই শেষ বা অবসান ঘটবে না।

প্রারব্ধ কর্মের যে ফল মিলবার বা পাওয়ার, তার দুটি ভেদ আছে—একটি প্রাপ্ত ফল, অপরটি অপ্রাপ্ত ফল। এখন প্রাণীগণের সামনে যে অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতি এসে পড়ছে, তা হল 'প্রাপ্ত' ফল আর এই জন্মেই যে অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থা ভবিষ্যতে আসবে, তাই হল 'অপ্রাপ্ত' ফল।

ক্রিয়মাণ কর্মসমূহের যে ফল-অংশ সঞ্চিতের মধ্যে জমা হয়ে থাকে তাই প্রারব্ধ হয়ে অনুকূল, প্রতিকূল এবং মিশ্র পরিস্থিতির আকারে মানুষের সামনে এসে উপস্থিত হয়ে থাকে। অতএব যতদিন সঞ্চিত কর্ম থাকে,

ততদিন প্রারব্ধ সৃষ্ট হতেই থাকে এবং প্রারব্ধও পরিস্থিতিরূপে পরিণত হয়েই চলে। এই পরিস্থিতি মানুষকে সুখী-দুঃখী হতে বাধ্য করে না। সুখী-দুঃখী হওয়ার ব্যাপারে তো পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে সম্বন্ধ-স্থাপনই হল মূল কারণ। পরিস্থিতির সঙ্গে সম্বন্ধ-স্থাপন করা বা না-করার ব্যাপারে মানুষ সর্বথা স্বাধীন, কখনও পরাধীন নয়। যে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে আপন সম্বন্ধ স্বীকার করে নেয়, সেই অবিবেচক পুরুষ তো সুখী-দুঃখী হতেই থাকে। কিন্তু যে পরিস্থিতির সঙ্গে আপন সম্বন্ধকে স্বীকার করে না, সেই বিবেকী পুরুষ কখনও সুখী বা দুঃখী হয় না। অতএব তার স্থিতি বা অবস্থান সর্বদা স্বতই সাম্যাবস্থাতেই হয়ে থাকে, যা কিনা তার স্বরূপ বা স্বাভাবিক রূপ।

কর্মসমূহের মধ্যে মানুষের জীবনে প্রাধান্য কার ? প্রারব্ধের না পুরুষার্থের ? অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রারব্ধ বলবান্ না পুরুষার্থ ? এই বিষয়ে নানারকম শঙ্কা, চিন্তা-ভাবনা, প্রশ্ন উঠে থাকে। সে সবের সমাধান বা নিরসনের জন্য প্রথমে এটি বুঝে নেওয়া দরকার যে প্রারব্ধই বা কী, আর পুরুষার্থই বা কী ?

মানুষের মধ্যে চাররকমের চাওয়া বা কামনা দেখা যায়—এক ধনের বা অর্থের, দ্বিতীয় ধর্মের, তৃতীয় ভোগের, চতুর্থ মুক্তির। প্রচলিত ভাষায় এই চারটিকে যথাক্রমে বলা যায় অর্থ, ধর্ম, কাম এবং মোক্ষ।

(১) অর্থ—ধনসম্পদকে 'অর্থ' বলা হয়। সেই ধন দুরকমের হয়ে থাকে—স্থাবর ও জঙ্গম। সোনা-রূপা, টাকাকড়ি, জমি-জায়গা, বাড়ী-ঘর এগুলি হল স্থাবর এবং গোরু, মোষ, ঘোড়া, উট, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি হল জঙ্গম।

(২) ধর্ম—সকাম অথবা নিষ্কামভাবে যে যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ব্রত, তীর্থ আদি করা হয়, তাকে ধর্ম বলা হয়।

(৩) কাম—সাংসারিক সুখভোগকে 'কাম' বলে। সেই সুখভোগ আটরকমের হয়ে থাকে—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, মান, শ্রেষ্ঠতা এবং

আরাম।

(ক) শব্দ—শব্দ দুরকমের হয়ে থাকে—বর্ণাত্মক এবং ধ্বন্যাত্মক ব্যাকরণ, সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি হল বর্ণাত্মক শব্দ।* খোলে বাদ্যযন্ত্র (ঢোল, তবলা প্রভৃতি), ধাতব, তার ও ফুৎকারের বাজন এবং তালের আধা-বাজনা—এই সাড়ে তিনরকম বাজনা ধ্বন্যাত্ম শব্দকে প্রকাশ করে থাকে।* এই বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ শুনলে যে সু বা আনন্দ লাভ হয়, তাই হল শব্দজন্য সুখ।

(খ) স্পর্শ—স্ত্রী, পুত্র, মিত্রাদির সঙ্গে মিলনে এবং ঠাণ্ডা, গরম, নরম কোমলাদি বস্তুর সঙ্গে ত্বকের বা চর্মের সংযোজনাজন্য যে সুখ হয়, তাই হ স্পর্শসুখ।

(গ) রূপ—চোখ দিয়ে খেলা, সিনেমা, ম্যাজিক, বন, পাহাড়, নদী সরোবর, সমুদ্র, প্রাসাদ ইত্যাদি সুন্দর জিনিস দেখে যে সুখ হয়, তাই হ রূপের সুখ।

(ঘ) রস—মিষ্টি, টক, নোন্‌তা, ঝাল, তেতো, কটু—এই ছয় রক রসের আস্বাদনে যে সুখ লাভ হয়, তাই হল রসের বা আস্বাদনের সুখ।

(ঙ) গন্ধ—আতর, সুগন্ধি তেল, সেন্ট্‌, সাবান, ল্যাভেণ্ডার, চন্দন ফুল ইত্যাদি সুগন্ধ অথবা পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি উগ্রগন্ধযুক্ত পদার্থকে নাক

---

*বর্ণাত্মক শব্দেও দশটি রস হয়ে থাকে—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত ও বাৎসল্য। এই দশটি রসই চিত্ত দ্রবিত অর্থা বিগলিত হওয়ার ফলে হয়। এই দশটি রসের উপযোগ অর্থাৎ সদ্ব্যবহার যা ভগবানের জন্য করা হয় তাহলে এ সব রসই কল্যাণকারক হয়ে যায় আর এগুলি দ্বারা যদি কেবল সুখ ভোগ করা যায়, তাহলে এই সব রসই পতনকারক হ দাঁড়ায়।

*ঢোল, ঢোলক, তবলা, পাখোয়াজ, মৃদঙ্গ প্রভৃতি হল চামড়া বা 'খালে'র সেতার, সারেঙ্গী প্রভৃতি 'তারে'র, হারমোনিয়াম, বাঁশি ইত্যাদি 'হাওয়া' বা 'ফুঁ দিয়ে বাজাবার এবং ঝাঁঝ, করতাল, মন্দিরা প্রভৃতি 'তালে'র বাদ্য।

দিয়ে আঘ্রাণ করার দরুণ যে সুখ হয়, তাই হল গন্ধের সুখ।

(চ) মান—শরীরের আদর-যত্ন, সেবার ফলে যে সুখ লাভ হয়, তাই হল মানের সুখ।

(ছ) শ্রেষ্ঠতা—নামের প্রশংসা, বাহবা ইত্যাদি পাওয়ার ফলে যে সুখ হয়, তাই হল শ্রেষ্ঠতা বা নিজের বড়াইয়ের সুখ।

(জ) আরাম—একেবারে আলস্যে গা ভাসিয়ে দিয়ে নিষ্কর্মা হয়ে পড়ে থাকার যে সুখ, তারই নাম আরামের সুখ।

(৪) মোক্ষ—আত্মসাক্ষাৎকার, তত্ত্বজ্ঞান, কল্যাণ, উদ্ধার, ভগবদ্ দর্শন, ভগবৎ প্রেম ইত্যাদির নাম হল মোক্ষ বা মুক্তি।

অর্থ, ধর্ম, কাম আর মোক্ষ—এই চারটির মধ্যে যদি দেখা যায় তা হলে বোঝা যায় যে অর্থ এবং ধর্ম, এই দুটি পরস্পর এক অপরের বৃদ্ধিকারক অর্থাৎ অর্থের থেকে ধর্মের এবং ধর্মের থেকে অর্থের বৃদ্ধি ঘটে থাকে। কিন্তু ধর্মের পালন যদি কেবল কামনাপূর্তির জন্য করা যায়, তা হলে সেই ধর্মও কামনাপূরণ করে দিয়েই বিনষ্ট হয়ে যায়। তেমনি অর্থও যদি কামনা-পূরণেই লাগানো হয়, তা হলে সেই অর্থও কামনাপূর্তি করেই নষ্ট হয়ে যায়। তাৎপর্য হল এই যে, কামনা ধর্ম এবং অর্থ দুইকেই খেয়ে ফেলে। এইজন্য ভগবান গীতায় কামনাকে 'মহাশন' অর্থাৎ মহা পেটুক বা খাদক বলে চিহ্নিত করে তাকে ত্যাগ করার কথাই বিশেষভাবে বলেছেন (৩।৩৭-৪৩)। যদি ধর্মের অনুষ্ঠান কামনা-ত্যাগ করে করা যায়, তা হলে তা অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করে মুক্ত করে দেয়। তেমনিই অর্থ বা ধনকেও যদি কামনা ত্যাগ করে অন্যের উপকারে, হিতসাধনে, সুখসম্পাদনে খরচ করা যায় তা হলে তাও অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করে মুক্ত করে দেয়।

অর্থ, ধর্ম, কাম আর মোক্ষ—এই চারটির মধ্যে 'অর্থ' অর্থাৎ ধন এবং 'কাম' অর্থাৎ ভোগ, এই দুইয়ের প্রাপ্তিতে প্রারব্ধেরই মুখ্যতা বা প্রাধান্য এবং পুরুষার্থের গৌণতা অর্থাৎ অপ্রাধান্য। তেমনি আবার 'ধর্ম' এবং 'মোক্ষে' পুরুষার্থেরই প্রাধান্য এবং প্রারব্ধের গৌণতা বা নগণ্যতা। প্রারব্ধ

এবং পুরুষার্থ এই দুয়েরই ক্ষেত্র আলাদা-আলাদা এবং দুই-ই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রধান। সেইজন্য বলা হয়েছে—

সন্তোষস্ত্রিষু কর্তব্যঃ স্বদারে ভোজনে ধনে।
ত্রিষু চৈব ন কর্তব্যঃ স্বাধ্যায়ে জপদানয়োঃ।।

অর্থাৎ নিজের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারে, ভোজনে এবং ধনে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আর স্বাধ্যায়, পূজা-পাঠ, নাম-জপ, কীর্তন এবং দানে কখনও সন্তোষের ভাব আসতে দেওয়া উচিত নয় অর্থাৎ যথেষ্ট হয়েছে এই ভেবে কখনও আত্মতৃপ্ত হওয়া উচিত নয়। এর তাৎপর্য হল এই যে, প্রারব্ধের ফলরূপে লব্ধ ধন এবং ভোগে সন্তোষের ভাব রাখা উচিত, তার কারণ প্রারব্ধ অনুসারে যতটুকু মিলবার ততটুকুই মিলবে, তার বেশি নয়। কিন্তু ধর্মের অনুষ্ঠান এবং নিজের কল্যাণ-সাধনরূপ কর্মে কখনও যেন সন্তোষ না আসে, কারণ এ হল নতুন পুরুষার্থ অর্থাৎ নব প্রয়াস, নতুন করে চেষ্টা। এতে যেন তৃপ্তি, সন্তোষ না আসে, শৈথিল্য না দেখা দেয়, কারণ এই পুরুষার্থ, নিজস্ব চেষ্টার জন্যই এই মনুষ্য-শরীর পাওয়া গিয়েছে।

কর্মের দুই ভেদ—শুভ অর্থাৎ পুণ্য এবং অশুভ অর্থাৎ পাপ। শুভ কর্মের ফল অনুকূল পরিস্থিতি প্রাপ্ত হওয়া আর অশুভ কর্মের ফল প্রতিকূল অবস্থা লাভ। কর্ম বাইরে থেকে করা হয়ে থাকে এবং সেই কারণে সেই কর্মের ফলও বাইরের পরিস্থিতিরূপেই লব্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু সেই সব পরিস্থিতিতে যে সুখ-দুঃখ হয়, তা কিন্তু ভিতরে অর্থাৎ অন্তরেই হয়। সেইজন্য ঐ সব পরিস্থিতিতে সুখী বা দুঃখী হওয়া শুভাশুভ কর্মের অর্থাৎ প্রারব্ধের ফল নয়। আপন মূর্খতারই ফল। যদি সেই মূর্খতা বা মূঢ়তা দূর হয়ে যায়, ভগবানের উপর* অথবা

---

*লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে।
তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োঃ।।

অর্থাৎ যেমন বাচ্চার লালন-পালনে এবং তাড়ন বা শাসনে—দুইয়েতেই মায়ের যেমন অকারুণ্য অর্থাৎ করুণা, দয়া বা স্নেহের অভাব হয় না, তেমনি

প্রারব্ধের[†] উপর বিশ্বাস এসে যায় তা হলে প্রতিকূলের চেয়েও প্রতিকূল, চরম দুরবস্থার মধ্যেও চিত্তের প্রসন্নতা অক্ষুণ্ণ থাকবে, আনন্দ জাগবে। তার কারণ হল, প্রতিকূল অবস্থায় পাপ কেটে যায়, পাপ ক্ষয় হয়ে যায়, ভবিষ্যতে আর পাপ না করার বিষয়ে সচেতনতা আসে এবং পাপসমূহ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে অন্তঃকরণের শুদ্ধিও ঘটে থাকে। তাই এতগুলি লাভ এবং সেই কারণেই আনন্দ।

সাধকের উচিত অনুকূল এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির সদুপযোগ করা, দুরুপযোগ নয়। যদি অনুকূল পরিস্থিতি এসে যায়, তা হলে অনুকূল সব কিছু সামগ্রী বা বস্তুকে অন্যের মঙ্গলের জন্য সেবাবুদ্ধিতে খরচ করা বা লাগিয়ে দেওয়ার নামই সদুপযোগ বা সদ্ব্যবহার। আর সেই সব সামগ্রী বা বস্তুসমূহকে সুখবুদ্ধিতে নিজে ভোগ করার নাম দুরুপযোগ। ঠিক তেমনই যদি প্রতিকূল পরিস্থিতি এসে যায় তা হলে সুখের ইচ্ছা ত্যাগ করা এবং আমার পূর্বকৃত পাপের নাশ করার জন্য, ভবিষ্যতে পাপ না করার জন্য সচেতন করে দেবার অভিপ্রায়ে এবং আমার উন্নতি সাধনের জন্যই প্রভুর কৃপাতে এমন পরিস্থিতি এসে পড়েছে—এইভাবে বুঝে নিয়ে পরম প্রসন্ন থাকাই হল প্রতিকূল পরিস্থিতির সদুপযোগ। আর তাতে দুঃখী বোধ করাই হচ্ছে দুরুপযোগ।

মনুষ্যদেহ সুখ-দুঃখ ভোগের জন্য নয়। সুখভোগের স্থান হল স্বর্গাদি আর দুঃখভোগের স্থান নরক তথা চুরাশি লক্ষ যোনি বা জন্ম। সেইজন্য

জীবের গুণ ও দোষের যিনি নিয়ন্তা, সেই মহেশ্বরেরও কোথাও কারুর উপর অকারুণ্য, দয়ার অভাব ঘটে না।

[†]যদ্ভাবি তদ্ভবত্যেব যদভাব্যং ন তদ্ভবেৎ।
ইতি নিশ্চিতবুদ্ধীনাং ন চিন্তা বাধতে ক্বচিৎ।। (নারদপুরাণ, পূর্ব ৩৭।৪৭)

অর্থাৎ যা হবার তাই হবেই, আর যা না হবার তা কখনই হবে না—এইরকম স্থির নিশ্চয় এসে যায় যাঁদের বুদ্ধিতে, তাঁদের কোন চিন্তাই পীড়িত করে না কখনও।

সেগুলি হল ভোগযোনি আর মনুষ্য হল কর্মযোনি। কিন্তু তাদেরই জন্য এ
কর্মযোনি যারা মনুষ্য শরীরে সাবধান বা সজাগ হন না। কেবল জন্ম-মৃত্যু
সাধারণ প্রবাহেই পতিত হয়ে আছেন। বাস্তবে মনুষ্য শরীর পাওয়া গিয়ে
সুখ-দুঃখের উপরে উঠবার জন্য অর্থাৎ মুক্তিলাভের জনাই। এইজন্য এ
কর্মযোনি না বলে 'সাধনযোনি'ই বলা উচিত।

প্রারব্ধ কর্মের ফলস্বরূপ যে অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতি এসে থাকে
সেই দুইয়ের মধ্যে অনুকূল পরিস্থিতিকে স্বরূপত ত্যাগ করার ব্যাপারে মা
স্বতন্ত্র বা স্বাধীন কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতিকে স্বরূপত ত্যাগ করায় সে পরাধি
অর্থাৎ তা স্বরূপত ত্যাগ করা যায় না। তার কারণ হল এই যে, অনুকূ
পরিস্থিতি অন্যের ভালো করা, অপরকে সুখ দেওয়ার ফলরূপে সৃষ্ট হয়ে
আর প্রতিকূল পরিস্থিতি অন্যদের দুঃখ দেওয়ার ফলরূপেই সৃষ্ট হয়ে থাকে
নিম্নলিখিত একটি দৃষ্টান্ত থেকে এটি বোঝা যেতে পারে—

শ্যামলাল রামলালকে একশো টাকা ধার দিল। রামলাল কথা দিল
অমুক মাসে সুদশুদ্ধ টাকা ফিরিয়ে দেবে। মাস কেটে গেল কিন্তু রামল
টাকা ফেরৎ দিল না। তখন শ্যামলাল রামলালের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থি
হল এবং বলল: 'তুমি তোমার কথামত তো টাকা দিলে না। এখন দাও
রামলাল বলল: 'এখন আমার কাছে তো টাকা নেই, পরশু দিয়ে দেব
শ্যামলাল তৃতীয় দিনে আবার গিয়ে উপস্থিত হল এবং বলল : 'কই
আনো আমার টাকা।' রামলাল বলল : 'আমি এখনো আপনার টাকা
জোগাড় করতে পারিনি, পরশু আপনাকে নিশ্চয় দিয়ে দেব।' তৃতীয় দি
আবার শ্যামলাল গিয়ে হাজির হল ও বলল : 'দাও টাকা'। তখন রামলা
বলল : 'কাল অবশ্যই দেব।' পরের দিন শ্যামলাল আবার গিয়ে উপস্থি
হল ও বলল : 'আনো আমার টাকা।' তখন রামলাল বলল : 'টাকা জোগা
করতে পারিনি, নিজের কাছেও কোনো টাকা নেই, তো তোমাকে দি
কোথা থেকে ? পরশু এসো।' রামলালের কথা শুনে শ্যামলালের রা
চড়ে গেল আর 'পরশু দেব, পরশু দেব করছ অথচ টাকা দেবার নাম নেই

এই বলে রামলালকে জুতোর পাঁচ ঘা মেরে বসল। রামলাল তখন গিয়ে কোর্টে নালিশ করে দিল। শ্যামলালকে তলব করা হল এবং জিজ্ঞাসা করা হল : 'তুমি এর বাড়ীতে গিয়ে একে জুতো মেরেছ ?' শুনে শ্যামলাল বলল : 'হ্যাঁ সাহেব, আমি জুতো মেরেছি।' ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তখন জিজ্ঞাসা করলেন : 'কেন মেরেছ ?'

শ্যামলাল বলল : 'একে আমি টাকা ধার দিয়েছিলাম এবং এ কথা দিয়েছিল, অঙ্গীকার করেছিল যে এই মাসের মধ্যে টাকা ফেরৎ দিয়ে দেবে। মাস কেটে গেল, আমি ওর বাড়ী গিয়ে যখন টাকা চাইলাম, তখন সে আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু এই বলে আমাকে ভয়ানক বিরক্ত করেছে, তাতেই আমি রেগে গিয়ে ওকে পাঁচ ঘা জুতো মেরে বসেছি। তা হুজুর! পাঁচ জুতোর পাঁচ টাকা কেটে নিয়ে বাকি টাকা আমাকে দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন্।'

ম্যাজিস্ট্রেট তখন হেসে বলল : 'এটা তো ফৌজদারী কোর্ট। এখানে টাকা দেওয়াবার কোন নিয়ম বা ব্যবস্থা নেই। এখানে শুধু দণ্ড দেবার ব্যবস্থা। তাই আপনার পাঁচ জুতো মারার বদলে জেল বা জরিমানা ভোগ করতেই হবে। আপনার যদি টাকা ফেরৎ নিতে হয়, তাহলে দেওয়ানী আদালতে গিয়ে নালিশ করতে হবে, সেখানে টাকা দেওয়াবার বিধি-বিধান আছে, কারণ সে বিভাগ আলাদা।'

এই কাহিনীর দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে অশুভ কর্মের ফলে যে প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখা দেয়, তা হল 'ফৌজদারী'র মতো এবং সেই কারণেই তাকে স্বরূপত ত্যাগ করা যায় না। আর শুভ কর্মের ফলস্বরূপ যে অনুকূল পরিস্থিতি হয় তা হল 'দেওয়ানী' এবং সেই কারণে তাকে স্বরূপত ত্যাগ করা যেতে পারে অর্থাৎ তার হেরফের হতে পারে। এর থেকে এইটিই সিদ্ধ বা প্রমাণিত হল যে মানুষের শুভ-অশুভ কর্মের বিভাগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা আলাদা-আলাদা। এই কারণে শুভ কর্ম অর্থাৎ পুণ্যের এবং অশুভ কর্ম অর্থাৎ পাপের সংগ্রহ আলাদা-আলাদাভাবে হয়ে থাকে। সাধারণভাবে

এরা একে অপরটির দ্বারা বিদূরিত বা বিনষ্ট হয় না অর্থাৎ এদের পরস্পরের মধ্যে কাটাকাটি হয় না। পাপের দ্বারা পুণ্য কেটে যায় না, না পুণ্যের দ্বার পাপ। তবে হ্যাঁ, অবশ্য মানুষ যদি পাপ কাটাবার বা বিদূরিত করার উদ্দেশ্যে প্রায়শ্চিত্তরূপে শুভ কর্ম বা কিছু পুণ্য করে, তা হলে তার পাপ কেটে যেতে পারে।

সংসারে দেখা যায় একজন মানুষ পুণ্যাত্মা, সদাচারী অথচ দুঃখকষ্ট ভোগ করছেন। তেমনি আর একজন পাপাত্মা, দুরাচারী, দিব্যি সুখভোগ করে যাচ্ছে। এই ব্যাপারটি নিয়ে ভালোভালো মানুষের মনেও এই শঙ্কা বা খট্‌কা জাগে যে এর মধ্যে ভগবানের ন্যায় অর্থাৎ যথাযথ বিচার রইল কোথায় ? এই প্রসঙ্গে মহাভারতের এই উপাখ্যানটি উল্লেখ করা যায়—

মহাভারতের বনপর্বে একটি কাহিনী পাওয়া যায়। একদিন দ্রৌপদী মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে, আপনি ধর্মকে ছেড়ে এক পাও অগ্রসর হন না কিন্তু আপনি বনবাসের দুঃখ ভোগ করছেন। আর দুর্যোধন ধর্মের কিছুমাত্র পরোয়া না করে কেবল স্বার্থপরায়ণ হয়ে আছে কিন্তু সে বেশ রাজ করছে, আরামে রয়েছে এবং সুখ ভোগ করে চলেছে। এইরকম আক্ষেপ করার পর যুধিষ্ঠির বললেন যে, সুখ পাওয়ার ইচ্ছায় যাঁরা ধর্মের পালন করে থাকেন, তাঁরা ধর্মের তত্ত্ব জানেনই না। তাঁরা তো পশুদের মতো সুখভোগের জন্য লোলুপ এবং দুঃখের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়েই থাকেন। তা বেচারারা ধর্মের তত্ত্বকে জানবেন কেমন করে ? সেইজন্য মানুষের মনুষ্যত্ব শুধু এরই মধ্যে নিহিত যে তারা অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতির পরোয়া না করে শাস্ত্রের আজ্ঞা বা নির্দেশ অনুসারে কেবল আপন ধর্মের, কর্তব্যের পালন করে চলতে থাকে।

এর সমাধান হল এই যে, এখন পুণ্যাত্মা যে দুঃখ ভোগ করছে, এটা আগের কোনো জন্মে করা পাপের ফল, এখন যে পুণ্য করছে তার ফল নয়। ঠিক তেমনিই এখন পাপাত্মা যে সুখ ভোগ করছে, এ-ও তার পূর্বে কোনো কোন জন্মে করা পুণ্যের ফল। এখন করা পাপের ফল নয়।

এই ব্যাপারে আরও কিছু তত্ত্বকথা আছে। কর্মের ফলস্বরূপ যে অনুকূল পরিস্থিতি এসে থাকে মানুষের জীবনে, তাতে কেবল সুখই হয়, আর প্রতিকূল পরিস্থিতি এলে তাতে কেবল দুঃখই হয়, এমন কথা কিন্তু ঠিক নয়। যেমন, অনুকূল পরিস্থিতি এলে মনে অহংকার জন্মায়, ছোটদের প্রতি ঘৃণা দেখা দেয়, নিজের চেয়েও বেশি ঐশ্বর্যশালীকে দেখলে তার উপর ঈর্ষা জন্মায়, অসহিষ্ণুতা, মনের ক্ষোভ বা জ্বালা দেখা দেয়, এমনকি মনে এমন দুষ্ট চিন্তাও এসে যায় যে ওর সম্পত্তি কিভাবে নষ্ট হয়ে যায়, সময় সময় তাকে নীচু বা হেয় করে দেখাবার চেষ্টাও এসে যায়। এইভাবে সুখ-সামগ্রী এবং ধনসম্পত্তি কাছে থাকা সত্ত্বেও সে সুখী হতে পারে না। অথচ বাইরের লোকের কাছে তার এই ঐশ্বর্য, সম্পত্তি দেখে এই বিভ্রান্তি জন্মে যে সে পরম সুখী। আবার তেমনিই কোন বৈরাগ্যবান ত্যাগী মানুষকে দেখে ভোগসম্পদশালী মানুষের তার উপর দয়া বা অনুকম্পা জন্মায় এই ভেবে যে বেচারার ধনসম্পদাদি কিছুই নেই, বেচারা বড় দুঃখী। অথচ বাস্তবে সেই বিরাগী, ত্যাগীর মনে বড়ই শান্তি, অতল প্রসন্নতা বিরাজ করে। সেই শান্তি এবং প্রসন্নতা ধনদৌলতের দরুণ কোনও ধনীর মনে কখনো থাকতে পারে না। অতএব ধনসম্পদ থাকলেই সুখ হয় না আবার ধনের অভাব মাত্রেই দুঃখও হয় না। হৃদয়ের শান্তি ও প্রসন্নতারই নাম হল সুখ আর দুঃখের নাম হৃদয়ের জ্বালা ও সন্তাপ।

পুণ্য এবং পাপের ফলভোগের নিয়ম কিন্তু এক নয়। পুণ্য তো সমাপ্ত বা শেষ হয়ে যেতে পারে নিষ্কামভাবে ভগবানে অর্পণ করা হলে, কিন্তু পাপ ভগবানকে অর্পণ করা হলে শেষ হয় না। পাপের ফল তো ভুগতেই হয় কারণ ভগবানের আজ্ঞার বিরুদ্ধে করা হয় যে কর্ম, তা ভগবানে অর্পণ করবে কেমন করে ? বরং ভগবানের আজ্ঞানুসারে করা কর্ম, তাঁর নির্দেশমত অনুষ্ঠিত কর্মই একমাত্র ভগবানে অর্পিত হয়ে থাকে। এই বিষয়ে একটি গল্প আছে :

এক রাজা তাঁর প্রজাবর্গকে নিয়ে হরিদ্বারে গেলেন। তাঁর সঙ্গে

সবরকমের লোক ছিল। তাদের মধ্যে একজন চামারও ছিল। সেই চাম
ভাবল এই বেনিয়া ব্যবসায়ীরা বড় চতুর। এরা নিজেদের চালাকি
বুদ্ধিমত্তার জোরে ধনী হয়েছে। যদি আমিও ওদের এই বুদ্ধিমত্তা অনুসা
অর্থাৎ ওদেরই মতো বুদ্ধি খাটিয়ে চলতে পারি তা হলে আমিও বড়লো
হয়ে যাব। এই ভেবে সে এক চতুর বেনিয়ার ক্রিয়াকলাপের উপর নজ
রেখে চলতে লাগল। যখন হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডে পাণ্ডা এসে দান-পু
করাবার জন্য সংকল্প বাক্য পাঠ করাতে লাগল, তখন সেই বণিক বল
'আমি অমুক ব্রাহ্মণকে একশো টাকা ধার দিয়েছিলাম, আজ সেই টা
দানরূপে আমি শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে অর্পণ করছি।' পাণ্ডা সেইমত সংক
বাক্য পূরণ করে দিল। চামারটি তখন দেখল যে এই বেনে এক কানাকড়ি
না দিয়ে দিব্যি সকলের কাছে নাম কিনল যে সে একশো টাকা দান ক
দিয়েছে। কী চালাক! আমিই বা ওর চেয়ে কম যাই কিসে? তাই ভেবে য
পাণ্ডা তার কাছে এল সংকল্প করাবার জন্য তখন বলল : 'অমুক বে
আমাকে একশো টাকা ধার দিয়েছিল, তা আমি আজ সেই টাকা শ্রীকৃষ্ণ
অর্পণ করছি।' তার সেই গ্রাম্য ভাষা পাণ্ডা ভালো করে বুঝলও না এ
সেইমত সংকল্প করিয়ে দিল। এতে সেই চামার বড় খুশি হল এই ভেবে
আমিও ঐ বেনের মতোই একশো টাকা দান করে পুণ্য অর্জন করলাম।

সবাই বাড়ী ফিরে গেল। যথাসময়ে চাষবাস হল। ব্রাহ্মণ এবং চামারে
ক্ষেতে প্রচুর শষ্য জন্মাল। ব্রাহ্মণ তখন বেনেকে বলল : 'শেঠজি
আপনি যদি চান, তাহলে একশো টাকার শষ্য নিয়ে নিন, তাতে আপন
বরং লাভই হবার সম্ভাবনা। আমাকে তো আপনার ধার শোধ দিতেই হবে
বেনে তখন বলল : 'হে পূজনীয় ঠাকুরমশাই! যখন আমি হরিদ্বা
গিয়েছিলাম, তখন আমি আপনাকে ধার দেওয়া সেই একশো টাকা দ
করে দিয়ে এসেছি।' ব্রাহ্মণ বললেন : 'শেঠজি! আমি তো আপনার ক
থেকে একশো টাকা ধার নিয়েছি, দান তো নিইনি। তাই সে টাকা অ
রাখতে চাই না, সুদ সমেত পুরো টাকা শোধ করে দিতে চাই।' শেঠ বলল

'আপনি যদি দানই করতে চান, তাহলে আপনার বোন বা মেয়েকে দিয়ে দিতে পারেন। আমি তো একশো টাকা ভগবানকে অর্পণ করে দিয়েছি, তাই আমি ও টাকা আর নেব না।' তখন ব্রাহ্মণ বেচারা আর কি করে ? সে ফিরে গেল নিজের বাড়ীতে।

আবার এদিকে যে বেনের কাছ থেকে চামারটি একশো টাকা নিয়েছিল, সেই বেনে চামারের ক্ষেতে গিয়ে হাজির বলল : 'কই ? নিয়ে এসো আমার টাকা। তোমার অনেক শষ্য হয়েছে, আমাকে একশো টাকার শষ্য দিয়ে দাও।' চামারটি শুনে রেখেছিল যে ব্রাহ্মণ দিতে চাইলেও বেনে তার কাছ থেকে টাকা নেয়নি। তাই সে ভাবল যে আমিও তো সংকল্প করে ভগবানের উদ্দেশ্যে টাকা সঁপে দিয়ে এসেছি। তা হলে আমাকেই বা টাকা ফেরৎ দিতে হবে কেন ? এই ভেবে চামার তখন বেনেকে বলল : 'আমি তো অমুক শেঠজির মতো গঙ্গায় দাঁড়িয়ে সব টাকা শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করে দিয়েছি। তা হলে আমাকে আবার টাকা দিতে হবে কেন ?' বেনে বলল : 'তোর শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করে দেওয়ার দরুণ ধার তো মিটতে পারে না, কারণ তুই তো আমার কাছে ধার নিয়েছিলি, তুই সেটা ছেড়ে দিলে বা শ্রীকৃষ্ণকে দিয়ে দিলে আমার ধার কি করে মিটবে ? আমি তো আমার দেওয়া সেই একশো টাকা সুদসমেত ফেরৎ চাই, নিয়ে আয় আমার টাকা।' এই বলে সে ঐ চামারের কাছ থেকে নিজের প্রাপ্য টাকার সমান শষ্য নিয়ে ছাড়ল।

এই গল্প থেকে এইটিই বোঝা গেল যে আমার ঘাড়ে যে অন্যের দেনা আছে তা আমি ছেড়ে দিলেই তার থেকে নিষ্কৃতি বা রেহাই নেই। ঠিক তেমনি ভগবানের আজ্ঞানুসারে বা নির্দেশমত নিজের সব শুভ বা পুণ্য কর্ম ভগবানকে অর্পণ করে দিয়ে তার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি কিন্তু অশুভ কর্মের বা পাপের ফল তো আমাকে ভুগতেই হবে। সেইজন্য শুভ ও অশুভ কর্মের ধারা বা রীতি নিয়মকানুন এক রকমের নয়। যদি এইরকম নিয়ম চালু হয়ে যায় যে ভগবানে অর্পণ করে দিলেই সব ঋণ মকুব হয়ে

যাবে, সব পাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা যাবে, তা হলে তো প্রাণিমা
মুক্ত হয়ে যাবে। কেউ আর বদ্ধ থাকবে না। কিন্তু তাতো সম্ভব নয়।
হ্যাঁ, এর মধ্যে এক মার্মিক কথা হল এই যে, নিজেই নিে
সম্পূর্ণভাবে ভগবানে যে সমর্পণ করে দিতে পারে অর্থাৎ সর্বথা সর্ব
ভগবানের শরণে যদি কেউ আসতে পারে, তাঁরই আশ্রয় নিতে পারে,
পাপ-পুণ্য সর্বথা নষ্ট হয়ে যায়। দুই-ই ঘুচে যায়। যেমন ভাগবতে
হয়েছে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী ন রাজন্।
সর্বাত্মনা যঃ শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্॥ (১১।৫।

অর্থাৎ যে সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে শরণাগতবৎসল ভগবা
শরণে এসে যায় সে দেবতা, ঋষি, আত্মীয়স্বজন, পিতৃগণ—এঁদের ক
কাছেই ঋণী এবং সেবক হয় না।

গীতাতেও শ্রীভগবান নিজ মুখে সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন চিরপ্রা
সেই শ্লোকটিতে—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ (১৮।৬

দ্বিতীয় একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ধনসম্পদ এবং ভোগের প্রাপ্তি
লাভ প্রারব্ধ কর্মানুসারে হয়ে থাকে, এ কথাটি ঠিক বোঝা যায় না।
কারণ আমরা দেখতে পাই যে কেউ যদি ইন্‌কাম ট্যাক্স, সেলস্ ট্যাক্স ইত
না দিয়ে ফাঁকি দেয়, তা হলে তার টাকা বেঁচে যায়। আর যদি পুরো ট
মিটিয়ে দেয় তাহলে তার টাকা চলে যায়। তাহলে ধন-সম্পদের আ
যাওয়া অর্থাৎ লাভ-অলাভ প্রারব্ধের অধীন কি করে হয় ? তা তো চুরি
ফাঁকির অধীন হয়ে পড়ল।

এর সমাধান হচ্ছে এইরকম—বাস্তবে ধন লাভ করা এবং ে
করা— এই দুইয়ের মধ্যেও কারুর ধনলাভের প্রারব্ধ থাকে, ভোগের
আবার কারুর ভোগের প্রারব্ধ থাকে, ধনলাভের নয়, আবার কারও কা

ধন আর ভোগ দুইয়েরেই প্রারব্ধ থাকে। যার ধনলাভের প্রারব্ধ আছে অথচ ভোগের প্রারব্ধ নেই তার কাছে লাখ টাকা থাকলেও তার রোগের দরুণ তা ভোগ করতে পারে না, ডাক্তার-বৈদ্যের নিষেধের ফলে। তার খাওয়া-দাওয়া রুক্ষ, শুক্‌নোই কপালে জোটে। যার ভোগের প্রারব্ধ আছে কিন্তু অর্থের প্রারব্ধ নেই, তার কাছে টাকাকড়ি না থাকলেও তার সুখ বা আরামের কোনরকম কিছু কমতি বা লাঘব হয় না।* কারুর দয়ায়, বন্ধুত্বের দরুণ কোন কাজকর্ম জুটে গেলে প্রারব্ধ অনুসারে ভোগের সব সামগ্রী সে পেতেই থাকে।

যদি ধনের প্রারব্ধ না থাকে অর্থাৎ টাকাকড়ি কপালে না থাকে, তা হলে চুরি করলেও ধন মিলবে না। উল্‌টে চুরির কথা কোনোভাবে জানাজানি হয়ে গেলে নিজের সঞ্চিত ধনও খোয়া যাবে এবং দণ্ডও পেতে হবে। এখানে দণ্ড পাক্ বা না পাক্ কিন্তু পরলোকে তো দণ্ড পেতেই হবে। তার থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে না। যদি বা প্রারব্ধের বশে চুরি করতে গিয়ে ধন মিলেও যায় তবু তার সেই ধন ভোগ করা হয়ে উঠবে না। সেই ধন রোগে, চুরি-

*সর্বথা ত্যাগী অর্থাৎ সব কিছু যিনি সব রকমে ত্যাগ করে বসে আছেন, তাঁর ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে অনেক অনুকূল বস্তুসমূহ প্রচুর পরিমাণে তিনি পেয়ে থাকেন (সেগুলি স্বীকার বা গ্রহণ করেন বা না করেন, সে কথা আলাদা)। ত্যাগের মধ্যে আর একটি বিলক্ষণতা বা বৈশিষ্ট্য আছে এই যে, যে মানুষ ধনসম্পদ ত্যাগ করে দেয়, যার মনে ধনের কোন মহত্ত্বই নেই এবং নিজেকে যে ধনের অধীন বলে মনে করে না, তারজন্য ধনের বা অর্থসম্পদের এক নতুন প্রারব্ধ সৃষ্টি হয়ে যায়। তার কারণ ত্যাগও এক বিশেষ মহা পুণ্য, যা সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন প্রারব্ধ সৃষ্টি করে।

ধান নহীঁ ধীণো নহীঁ, নহীঁ রূপৈয়ো রোক।
জিমণ বৈঠে রামদাস, আন মিলৈ সব থোক॥

অর্থাৎ রামদাসের ঘরে অন্ন নেই, অর্থ নেই, কোন গবাদি পশুও নেই, অথচ খেতে বসামাত্র খাদ্যবস্তু একে একে সব উপস্থিত হয়।

ডাকাতিতে, মোকদ্দমায়, বঞ্চনায় সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাৎপর্য হল এই যে, সে-ধন যতদিন টিকবার ঠিক ততদিনই থাকবে আর তার পর নষ্ট হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, ইনকাম ট্যাক্স্ ইত্যাদি ফাঁকি দেওয়ার যে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, অন্তরের সেই সংস্কার বা প্রবণতা জন্ম-জন্মান্তরেও তাকে চুরি করতে উস্কাতে থাকবে এবং তার দরুণ সে দণ্ড পেতেই থাকবে।

যদি ধনপ্রাপ্তি তার কপালে অর্থাৎ প্রারব্ধে থাকে তা হলে কেউ তাকে দত্তক নিয়ে নেবে কিংবা মরবার সময় কোন লোক তার নামে উইল করে দিয়ে যাবে অথবা বাড়ী তৈরী করতে গিয়ে ভিত্ খোঁড়ার সময় মাটির তলায় পোঁতা গুপ্তধন মিলে যাবে ইত্যাদি। এইভাবে প্রারব্ধ অনুসারে যে ধন মিলবার, তা কোন না কোন ভাবে পাওয়া যাবেই।

প্রাপ্তব্যমর্থং লভতে মনুষ্যো দৈবোঽপি তং লঙ্ঘয়িতুং ন শক্তঃ।
তস্মান্ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে যদস্মদীয়ং ন হি তৎ পরেষাম্॥

(পঞ্চতন্ত্র, মিত্রসম্প্রাপ্তি ১১২)

অর্থাৎ 'যেটা পাওয়ার সেই অর্থ মানুষ পায়ই। দৈবও তা লঙ্ঘন করতে পারে না। সেই কারণে আমি চিন্তাও করি না, বিস্মিত হই না, যেহেতু যেটা আমার সেটা কখনও অন্যের হতে পারে না।'

কিন্তু মানুষ প্রারব্ধের উপর তো বিশ্বাস করে না, অন্তত আপন পুরুষার্থের উপরও বিশ্বাস রাখে না যে আমি পরিশ্রম করে উপার্জন করে তাই ভোগ করব। সেই কারণেই তার চুরি ইত্যাদি দুষ্কর্মে প্রবৃত্তি দেখা দেয়, যার ফলে তার হৃদয়ে জ্বালা থেকেই যায়। অন্যদের কাছ থেকে লুকোতে হয়, ধরা পড়লে দণ্ড পেতে হয় ইত্যাদি। যদি মানুষ বিশ্বাস রাখতে পারে এবং সন্তুষ্টি রাখে, তা হলে তার হৃদয়ে মহাশান্তি, আনন্দ, প্রসন্নতা বিরাজ করে এবং যে ধন আসবার তা এসেও যায় এবং যতদিন বাঁচা তার ভাগ্যে নির্দিষ্ট, ততদিনের জন্য জীবন-যাত্রা-নির্বাহের উপযোগী জিনিষপত্রও কোন না কোনভাবে সে পেতেই থাকে।

যেমন, ব্যবসা-বাণিজ্যে লোকসান বা ঘাটতি, বাড়ীতে কারও মৃত্যু,

বিনা কারণে অপযশ এবং অপমানিত হওয়া ইত্যাদি প্রতিকূল পরিস্থিতি, কেউ না চাইলেও এসেই পড়ে। তেমনি আবার অনুকূল পরিস্থিতিও এসেই থাকে, কেউ তাকে আটকাতে পারে না। ভাগবতে একটি শ্লোক দেখা যায় :

সুখমৈন্দ্রিয়কং রাজন্ স্বর্গে নরক এব চ।
দেহিনাং যদ্ যথা দুঃখং তস্মান্নেচ্ছেত তদ্ বুধঃ ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৮।১)

অর্থাৎ 'হে রাজন্! মানুষের বিনা ইচ্ছাতেই প্রারব্ধ অনুসারে যেমন দুঃখ পেতে হয়, তেমনিই স্বর্গে বা নরকে ইন্দ্রিয়জন্য সুখও লাভ হয়ে থাকে। তাই বুদ্ধিমান লোকের উচিত ঐসব সুখের কামনা না করা।'

যেমন ধনসম্পদ এবং ভোগ, এই দুইয়ের প্রারব্ধ আলাদা-আলাদা হয়ে থাকে অর্থাৎ কারুর ধনের ভাগ্য হয়ে থাকে, কারুর বা ভোগের, ঠিক তেমনিই ধর্ম এবং মোক্ষের পুরুষার্থ বা প্রচেষ্টা আলাদা-আলাদা হয়ে থাকে অর্থাৎ কেউ ধর্মের জন্য প্রচেষ্টা করে আবার কেউ বা মোক্ষের জন্য। ধর্মের অনুষ্ঠানে দেহ, ধন ইত্যাদি বস্তুরই প্রাধান্য থাকে, আর মোক্ষপ্রাপ্তিতে বা মুক্তিলাভে ভাব এবং বিচারেরই থাকে প্রাধান্য।

একটা হল 'করা' আর এক হল 'হওয়া'। দুটি বিভাগ আলাদা-আলাদা। করার বিষয় হল কর্তব্য আর হওয়ার বিষয় হল লব্ধব্য বা ফল। মানুষের কর্ম করাতেই অধিকার, ফলে নয়—**'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'** (গীতা ২।৪৭)। এর তাৎপর্য হল এই যে হওয়ার পূর্তি অর্থাৎ সফলতা প্রারব্ধ অনুসারে অবশ্যই হয়ে থাকে, তার জন্য 'এটা হওয়া উচিত, এটা হওয়া উচিত নয়' এমন ইচ্ছা করতে নেই, আর করার ব্যাপারে শাস্ত্র ও লোক-মর্যাদা অনুসারে কর্তব্য-কর্ম করে যাওয়া উচিত। 'করা' হল পুরুষার্থের অধীন বা নিয়ন্ত্রণে আর 'হওয়া' হল প্রারব্ধের এক্তিয়ারে বা অধীনে। তাই মানুষ করাতে স্বাধীন আর হওয়াতে পরাধীন। মানুষের উন্নতির পক্ষে মূল কথা হল—**'করাতে থেকো সাবধান আর হওয়াতে থেকো প্রসন্ন'**।

ক্রিয়মাণ, সঞ্চিত এবং প্রারব্ধ—তিন কর্ম থেকে মুক্ত হওয়ার

উপায় কী ?

তা হলে দেখা গেল—প্রকৃতি এবং পুরুষ—এই দুটি আছে। তার মধ্যে প্রকৃতি হল সদা ক্রিয়াশীল কিন্তু পুরুষে কখনও পরিবর্তনরূপ ক্রিয়া ঘটে না। প্রকৃতির সঙ্গে আপন সম্বন্ধ স্বীকার করে নেয় যে, সেই প্রকৃতিস্থ পুরুষই কর্তা-ভোক্তা হয়ে যায়। যখন সে প্রকৃতি থেকে এই সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করে দেয় অর্থাৎ শুধু আপন স্বরূপে অবস্থিত হয়ে যায়, তখন আর তাতে কোন কর্ম আরোপিত হয় না।

এখন প্রারব্ধ নিয়ে আর যে সব কথা ওঠে, প্রারব্ধসম্বন্ধী সেই সব কথাগুলি হল এই :

(১) বোধ, উপলব্ধি বা জ্ঞান হয়ে যাওয়ার পরও জ্ঞানীর প্রারব্ধ থেকে যায়—এই কথা যে বলা হয়ে থাকে, তা কেবল অজ্ঞানীদের বোঝানোর জন্য। তার কারণ হল এই যে, অনুকূল বা প্রতিকূল ঘটনা ঘটে যাওয়ার নামই 'প্রারব্ধ'। প্রাণী বা জীবকে সুখী বা দুঃখী করা প্রারব্ধের কাজ নয়। তা হল অজ্ঞানের কাজ। অজ্ঞান মিটে গেলে অর্থাৎ দূর হলে মানুষ আর সুখী বা দুঃখী হয় না। তার তখন শুধু অনুকূলতা ও প্রতিকূলতার বোধমাত্র হয়। জ্ঞান বা বোধ হওয়া দোষের নয়। দোষের হল সুখ-দুঃখরূপ বিকার হওয়া। সেইজন্য বাস্তবে জ্ঞানীর প্রারব্ধ বলে কিছু থাকে না।

(২) প্রারব্ধ যেমন হয়, বুদ্ধিও তেমনি তৈরী হয় বা সৃষ্ট হয়। যেমন, একই বাজারে এক ব্যবসায়ী মাল বিক্রী করে দেয়, আর এক ব্যবসায়ী মাল কিনে নেয়। পরে বাজার যখন তেজী বা চড়া হয়, তখন যে বিক্রী করেছিল তার ক্ষতি হয় আর যে কিনেছিল তার লাভ হয়ে যায়। আবার তেমনি যখন বাজারে মন্দা ভাব দেখা দেয়, তখন বিক্রয়কারীর হয় লাভ, আর ক্রয়কারীর ঘটে লোকসান। সুতরাং দেখা গেল, কেনা-বেচার বুদ্ধি আসে প্রারব্ধ থেকে অর্থাৎ লাভ- লোকসানের যেমন কপাল যার, তদনুসারেই তার বুদ্ধি জন্মায়। যার দরুণ প্রারব্ধানুসারে অর্থাৎ ভাগ্যানুরূপ ফল ভোগানো যায়। কিন্তু কেনা-বেচারূপ কর্ম ন্যায়যুক্ত হবে কিংবা অন্যায়পূর্বক হবে

—এ বিষয়ে মানুষ স্বতন্ত্র কারণ সেটি হল ক্রিয়মাণ কর্ম অর্থাৎ নতুন কর্ম, প্রারব্ধ নয়।

(৩) একজনের হাত থেকে গেলাস পড়ে ভেঙ্গে গেল, তা এটা তার অসাবধানতার জন্য, না প্রারব্ধের বশে ?

কর্ম করার সময় সাবধান থাকা উচিত কিন্তু ভালো বা মন্দ যাই ঘটে যাক, তাকে পুরোপুরি প্রারব্ধ বলে বাধ্য হয়েই মেনে নেওয়া উচিত। তাতে যারা এ কথা বলেন যে যদি তুমি একটু সাবধান হতে তা হলে গেলাসটা ভাঙত না—তাতে এইটুকু শিক্ষা নেওয়া উচিত যে আমার আগে থেকেই সাবধান হওয়া দরকার, যাতে দ্বিতীয়বার এমন ভুল না হয়। বাস্তবে যা ঘটে গিয়েছে, তাকে অসাবধানতা বলে না মনে করে ঘটবারই ছিল, এই মনে করা উচিত। সেইজন্য **'করাতে' থাকবে সাবধান, আর 'হওয়াতে' থাকবে প্রসন্ন**।

(৪) প্রারব্ধজনিত রোগ ও কুপথ্যজনিত রোগে পার্থক্য কী ?

কুপথ্যজন্য রোগ ঔষধে সারতে পারে কিন্তু প্রারব্ধঘটিত রোগ ঔষধে সারে না। মহামৃত্যুঞ্জয় ইত্যাদি জপ এবং যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করলে প্রারব্ধজনিত রোগও কেটে যেতে পারে, অবশ্য যদি অনুষ্ঠান তেমন জোরদার বা প্রবল হয় তবেই।

রোগ দুরকমের আছে—আধি অর্থাৎ মানসিক রোগ এবং ব্যাধি অর্থাৎ শারীরিক রোগ। আধিরও দুই ভেদ আছে—এক তো শোক, চিন্তা ইত্যাদি আর দ্বিতীয় পাগলামি। চিন্তা, শোক ইত্যাদি তো অজ্ঞানের দরুণ হয়ে থাকে আর পাগলামি প্রারব্ধের ফলে হয়। সেইজন্য জ্ঞান হলে পর চিন্তা শোকাদি দূর হয়ে যায় কিন্তু প্রারব্ধের দরুণ পাগলামি থেকে যেতে পারে। তবে হ্যাঁ, পাগলামি হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানীর দ্বারা কখনও কোন অনুচিত শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম হয় না।

(৫) আকস্মিক মৃত্যু এবং অকাল মৃত্যুতে পার্থক্য কী ?

কেউ যদি সাপে কামড়ালে মারা যায়, আকস্মিকভাবে উপর থেকে পড়ে

গিয়ে মারা যায়, জলে ডুবে মারা যায়, হার্টফেল হয়ে মারা যায় কিংবা বে
দুর্ঘটনায় মারা যায় তখন তাকে 'আকস্মিক মৃত্যু' বলা হয়। স্বাভাবিক মৃত্
মতোই আকস্মিক মৃত্যুও প্রারব্ধ অনুসারে আয়ু পূর্ণ হয়ে যাওয়ার ফে
ঘটে থাকে।

কোন লোক যদি জেনেশুনে আত্মহত্যা করে বসে অর্থাৎ গলায় ফঁ
লাগিয়ে, কুয়োয় লাফ দিয়ে, গাড়ীর তলায় পড়ে, ছাদ থেকে লাফিয়ে, ি
খেয়ে বা শরীরে আগুন লাগিয়ে মরে যায় ,তা হলে তার সে মৃত্যু 'অকা
মৃত্যু' বলে পরিগণিত হবে, কারণ সে মৃত্যু আয়ু থাকতে থাকতেই ঘ
থাকে। আত্মহত্যাকারীর মনুষ্য-হত্যার পাপ লেগে যায় এবং সেই কারণে
হল নতুন পাপ-কর্ম, প্রারব্ধ নয়। এই মানবদেহ পরমাত্মপ্রাপ্তি
ভগবানকে লাভ করার জন্যই মিলেছে, অতএব আত্মহত্যা করে তাকে
করা মহা পাপ।

কয়েকবার আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেও মানুষ বেঁচে যায়, মরে না। ত
কারণ হল এই যে তার অন্য মানুষের প্রারব্ধের সঙ্গে সম্বন্ধ জোড়া থাকে
সেইজন্য তার প্রারব্ধের দরুণ সে বেঁচে যায়। যেমন, ভবিষ্যতে কারও ছে
হবার আছে আর এদিকে সে যদি আত্মহত্যার চেষ্টা করে তাহলে ভবিষ্য
যে ছেলে জন্মাবে তার প্রারব্ধ তাকে অর্থাৎ ভবিষ্যৎ পিতাকে মরতে দে
না। যদি সেই ব্যক্তি দ্বারা ভবিষ্যতে কোন বিশেষ ভাল কাজ হবার থাবে
লোকের উপকার হবার থাকে অথবা এই জন্মেই, এই দেহেই প্রারব্ধে
কোন উৎকট ভোগ, সুখ-দুঃখ আসার বা ভোগ করার থাকে, তাহে
আত্মহত্যার প্রয়াস করা সত্ত্বেও সে মরবে না।

(৬) একজন লোক দ্বিতীয় আর একজনকে খুন করল, মেরে বসল যে
এতে সে তার পূর্বজন্মের শত্রুতার শোধ নিল এবং যে মরল, সে তা
পুরানো কর্মের অর্থাৎ আগের কাজের, দুষ্কর্মের ফল পেল। এতে তা হবে
হত্যাকারীর কী দোষ ?

হত্যাকারীর দোষ আছে। দণ্ড দেওয়া হল শাসকের কাজ, সর্বসাধারণে

নয়। একজন লোকের দশটার সময় ফাঁসি হবার কথা। অন্য একজন লোক সেই ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত লোকটিকে জল্লাদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঠিক দশটার সময় তাকে কোতল করে বসল। এই পরিস্থিতিতে সেই হত্যাকারী লোকটিরও ফাঁসি হবে এই কারণে যে এই হুকুম অর্থাৎ মারবার ক্ষমতা তো রাজা বা সরকার জল্লাদকে দিয়েছিল, তোমাকে কে হুকুম দিয়েছিল ?

যে মারল তার স্মরণে ছিল না যে সে পূর্বজন্মের শোধ নিচ্ছে, তা সত্ত্বেও সে মারল, এটা তার দোষ। অন্য কাউকে মারবার অধিকার কারুরই নেই। মরতে কেউই চায় না। অন্যকে মারা মানে নিজের বিবেকের প্রতি অনাদর। মানুষমাত্রেরই আছে বিবেকশক্তি সেই বিবেক অনুসারে ভালো বা মন্দ কাজ করার ব্যাপারে সে স্বাধীন। অতএব বিবেকের অনাদর করে অন্যকে মারা বা মারবার ইচ্ছা করা অন্যায়।

যদি পূর্বজন্মের শোধ বা বদ্‌লা একে অপরের নিতে থাকে তা হলে এই শোধ-বোধের শৃঙ্খল কখনই শেষ হবে না আর মানুষ কোনদিন মুক্তও হতে পারবে না।

পূর্বজন্মের শোধ নেওয়া যেতে পারে অন্য যোনিতে, যেমন সর্পাদি যোনিতে। মনুষ্যযোনি শোধ নেওয়ার জন্য নয়। এমন অবশ্য হতে পারে পূর্বজন্মের খুনী লোকটিকে আমার স্বভাবতই ভাল লাগবে না, খারাপই লাগবে। কিন্তু যাকে খারাপ লাগবে সেই লোকটির প্রতি বিদ্বেষ করা বা তাকে কষ্ট দেওয়া অবশ্যই দোষের, কারণ এ হল নতুন কর্ম।

কেউ বলতে পারে, যেমন যার প্রারব্ধ তদনুসারেই তার বুদ্ধি হয়ে থাকে, তবে আর এতে দোষের কী আছে ?

বুদ্ধিতে যে দ্বেষ আছে, তার বশীভূত হয়ে গেলে তুমি—এই হল দোষ। তার উচিত এর বশীভূত না হয়ে বিবেকের সমাদর করা বা আশ্রয় নেওয়া। গীতাও তাই বলছেন, বুদ্ধিতে যে রাগ-দ্বেষ আছে, তার বশে এসো না অর্থাৎ তার অধীন হয়ো না—**'তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ'** (৩।৩৪)।

(৭) প্রারব্ধ এবং ভগবৎকৃপায় কী পার্থক্য ?

এই জীব যা কিছু লাভ করছে, তা প্রারব্ধ অনুসারেই সে পাচ্ছে কি
প্রারব্ধ বিধানের বিধাতা হলেন স্বয়ং ভগবান্। তার কারণ হল, কর্ম জ
হওয়ার দরুণ নিজে স্বাধীনভাবে কোন ফল দিতে পারে না। সেগুলি ে
ভগবানের বিধান বা নির্দেশ অনুসারেই ফল দিয়ে থাকে। যেমন, একজ
লোক সারাদিন ধরে যদি কারুর ক্ষেতে কাজ করে তো সন্ধ্যার সময় ত
কাজের অনুরূপ পয়সা বা মজুরী পেয়ে থাকে, কিন্তু সেই মজুরী সে প
ক্ষেতের মালিকের কাছ থেকে।

পয়সা তো মেলে কাজ করলে তবেই, বিনা কাজে কি পয়সা মিলে
পারে ?

পয়সা তো কাজ করলে তবেই পাওয়া যায় কিন্তু মালিক ছাড়া পয়
দেবেটা কে ? যদি কেউ জঙ্গলে গিয়ে দিনভোর মেহনত বা পরিশ্রম কে
তো তার কি পয়সা মিলবে ? কখনই মিলবে না। সেখানে দেখা হবে ক
কথায়, হুকুমে বা নির্দেশে সে কাজ করেছে এবং কার উপর এর দায়ি
ছিল।

যদি কোন চাকর-বাকর বা মজুর খুব তৎপরতার সঙ্গে বুদ্ধি খাটিয়ে পর
উৎসাহের সঙ্গে কোন কাজ করে শুধু মালিককে খুশি করার জন্য, তঁ
প্রসন্নতা লাভের জন্য, তাহলে মালিক তার মজুরীর চেয়ে বেশি পয়সা
দিয়ে দেন এবং তার তৎপরতা ইত্যাদি গুণ দেখে তাকে নিজের ক্ষেতে
অংশীদারও করে নেন। ঠিক তেমনিই ভগবান মানুষকে তার কর্ম অনুসারে
ফল দিয়ে থাকেন। যদি কোন মানুষ ভগবানের আজ্ঞানুসারে তঁ
প্রসন্নতার জন্য সব কাজ করে, তাকে ভগবান অন্যদের চেয়ে বেশীই দি
থাকেন কিন্তু যে ভগবানে সর্বথা সমর্পিত হয়ে সব কাজ করে থাকে
সেই ভক্তের ভগবানও ভক্ত হয়ে যান। তাই ভাগবতে বলা হয়ে
—**'এবং স্বভক্তয়ো রাজন্ ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্'** (১০।৮৬।৫৯)।

সংসারে কেউই চাকরকে নিজের মালিক করে বসায় না কিন্তু ভগবান শরণাগত ভক্তকে নিজের মালিক বানিয়ে নেন। এমন উদারতা শুধু এই প্রভুরই আছে। এমন প্রভুর চরণে শরণ না নিয়ে যে-মানুষ প্রাকৃত অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশশীল পদার্থসমূহের পরাধীন হয়েই থেকে যায়, তার বুদ্ধি সর্বথাই নষ্টভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। তারা এই কথাটুকু বুঝতেই পারে না যে আমার চোখের সামনে জন্মাচ্ছে ও মরছে, উৎপত্তি-বিনাশশীল এই যে পদার্থ-সমূহ, তারা আমাকে কতটুকু সাহায্য বা ভরসা দিতে পারে ?

(গীতা সাধক-সঞ্জীবনী গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশতম শ্লোকের ব্যাখ্যা থেকে)

বর্ণ-ব্যবস্থার তাৎপর্য

(১)

কর্ম হয় দুরকম—(ক) জন্মারম্ভক কর্ম এবং (খ) ভোগদায়ক কর্ম
সব কর্মে উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্ম হয়ে থাকে, তাদের 'জন্মারম্ভক কর্ম'
হয় আর যে সব কর্মে সুখ-দুঃখের ভোগ হয়, তাদের বলে 'ভোগা
কর্ম'। ভোগদায়ক কর্ম অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে,
গীতায় অনিষ্ট-ইষ্ট এবং মিশ্র নামে নির্দেশ করা হয়েছে (১৮।৪২)।

গভীর দৃষ্টিতে যদি দেখা যায়, তাহলে কর্মমাত্রেই ভোগদায়ক হয়ে
অর্থাৎ জন্মারম্ভক কর্ম দ্বারাও ভোগ হয় এবং ভোগদায়ক কর্ম দ্বারাও
হয়ে থাকে। যেমন, যার উত্তম বা শ্রেষ্ঠ কুলে জন্ম হয় তার সমাদর
সৎকার হয়, আবার যার নীচ বা নিকৃষ্ট কুলে জন্ম হয় তার অনাদর, তি
ঘটে থাকে। তেমনি অনুকূল পরিস্থিতিযুক্ত যারা, তাদের সমাদর হয়,
প্রতিকূল পরিস্থিতি যাদের, তাদের নিরাদর ঘটে। তাৎপর্য হল এই, আদ
নিরাদর রূপে ভোগ তো জন্মারম্ভক এবং ভোগদায়ক—দু'রকম ক
হয়ে থাকে। কিন্তু জন্মারম্ভক কর্মের দরুণ যে জন্ম হয়ে থাকে, তাতে আ
নিরাদররূপ ভোগ গৌণ হয়, কেননা আদর-অনাদর কখনও কখনও
থাকে, সর্বদাই ঘটে না। আর ভোগদায়ক কর্মের দরুণ যে অনুকূল-প্রতি
পরিস্থিতি এসে থাকে, তাতে সেই সেই পরিস্থিতির ভোগই প্রধান বা
হয়ে দেখা দেয় কারণ পরিস্থিতি সবসময়েই আসতে থাকে, তার বি
নেই।

ভোগদায়ক কর্মসমূহের সদুপযোগ বা দুরুপযোগ করার ব্যাপ

মনুষ্যমাত্রই স্বতন্ত্র বা স্বাধীন অর্থাৎ সেই অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সে সুখী-দুঃখীও হতে পারে আবার তাকে সাধন-সামগ্রীও করে তুলতে পারে অর্থাৎ সাধনার সুযোগ হিসাবেও গ্রহণ করতে পারে। অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যে সুখী বা দুঃখী হয়, তারা হল নির্বোধ বা মূর্খ। আর যারা তাকেই সাধনার বস্তু করে তোলে, তারা হল বুদ্ধিমান সাধক। তার কারণ হল এই যে, মনুষ্যজন্ম ভগবানকে লাভ করার জন্যই মিলেছে। সুতরাং এতে অর্থাৎ এই মনুষ্যজন্মে অনুকূল-প্রতিকূল যে কিছু পরিস্থিতিই আসুক না কেন, তার সব কিছুই সাধনের সামগ্রী বা উপকরণ।

অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সাধন-সামগ্রী করা মানে কী ?

অনুকূল পরিস্থিতি যদি এসে যায়, তা হলে তাকে অপরের সেবায়, অন্যের সুখ-আরামে লাগিয়ে দাও। আর প্রতিকূল পরিস্থিতি যদি আসে, তা হলে সুখের ইচ্ছা ত্যাগ করে দাও। অপরের সেবা করা এবং নিজের সুখেচ্ছা ত্যাগ করা—এই দুটিই হল সাধন।

(২)

শাস্ত্রে পাওয়া যায় যে পুণ্যের আধিক্য ঘটলে জীব স্বর্গে যায় আর পাপের আধিক্য হলে নরকে যায় এবং পুণ্য-পাপ দুই সমান হলে মানুষ হয়ে জন্মায়। এই দৃষ্টি অনুসারে যে কোন বর্ণ, আশ্রম, দেশ, বেশাদির যে কোন মানুষ সর্বথা পুণ্যাত্মা বা পাপাত্মা হতে পারে না অর্থাৎ পুরোপুরি পুণ্যে বা আগাগোড়া পাপে গড়া কোন মানুষ হতে পারে না।

পুণ্য-পাপ সমান হওয়ার দরুণই যে মানুষের সৃষ্টি, তাতেও লক্ষ্য করলে দেখা যায় পুণ্য-পাপের তারতম্য আছে অর্থাৎ কারুর পুণ্য বেশি, কারুর বা পাপ বেশি লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণরূপে বলা যায়—

যেমন পরীক্ষায় অনেক রকম বিষয় হয়ে থাকে এবং সেই সব বিষয়ের মধ্যে কোন বিষয়ে কম, কোন বিষয়ে বেশি নম্বর মেলে। সেই সব বিষয়ের নম্বরগুলি একত্র করে পুরো যত নম্বর হয়, তার থেকেই পরীক্ষার ফল

তৈয়ারী হয়ে থাকে। ঠিক তেমনিই প্রত্যেক মানুষের কোন বিষয়ে বেশি, আবার কোন বিষয়ে পাপ বেশি হয় এবং সব মিলিয়ে যত পাপ- হয়, তদনুসারেই তার জন্ম লাভ হয়। যদি আলাদা-আলাদা বিষয়ে সব পুণ্য-পাপ সমান হত, তাহলে সকলেরই সমানভাবে অনুকূল-প্রতি পরিস্থিতি লাভ হত, কিন্তু তা হয় না। সেই কারণে সকলেরই পুণ্য-প মধ্যে অনেক রকম তারতম্য ঘটে থাকে। সেই একই কথা সত্ত্বাদি গু বিষয়েও বুঝে নিতে হবে।

ঠিক তেমনি গুণেরও বিভাগ বা তারতম্য আছে। সব মিলিয়ে সত্ত্বগু প্রাধান্য যাঁদের, তাঁরা ঊর্ধ্বলোকে যান। রজোগুণের প্রাধান্য যাঁদের ম তাঁরা মধ্যলোক বা মনুষ্যলোকে আসেন এবং তমোগুণের প্রাধান্যযু অধোগতি লাভ করে থাকেন। আবার এই তিনের মধ্যেও গুণের তার অনুসারে অনেক রকমের ভেদ বা পার্থক্য ঘটে থাকে।

সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে ব্রাহ্মণ, রজোগুণের প্রাধান্য এবং সত্ত্বগু গৌণতা বা ঘাটতি থেকে ক্ষত্রিয়, রজোগুণের প্রাধান্য এবং তমোগু গৌণতা বা কম্‌তি থেকে বৈশ্য, তথা তমোগুণের প্রাধান্য থেকে শূদ্র হয়। এ তো সামান্য বা সাধারণভাবে গুণের কথা বলা হল। এখন এ মধ্যে অবান্তর তারতম্য বিচার করলে দেখা যায়—রজোগুণ প্রধান মানু মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রধান যাঁরা, তাঁরা হলেন ব্রাহ্মণ। সেই ব্রাহ্মণদের আবার জন্ম-ভেদ অনুসারে উঁচু ব্রাহ্মণ, নীচু ব্রাহ্মণ মানা হয় পরিস্থিতিরূপে কর্মের ফলও রকম-রকম ঘটে থাকে। অর্থাৎ সব ব্রাহ্মণে একই রকম সমান অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি ঘটে না। এই দৃষ্টিতে দে ব্রাহ্মণ যোনির মধ্যেও তিনটি গুণই মানতে হবে। তেমনি ক্ষত্রিয়, বৈ শূদ্রও জন্মানুসারে উঁচু-নীচু বলে মানা হয় এবং অনুকূল-প্রতি পরিস্থিতিও কত রকম-রকম হয়ে থাকে। এইজন্যই গীতার আ অধ্যায়ের চল্লিশতম শ্লোকে বলা হয়েছে যে তিন লোকে এমন কোনও নেই, যা তিনগুণ থেকে মুক্ত বা রহিত বা শূন্য।

তাছাড়া, মনুষ্যেতর যোনিগত যে পশু-পক্ষী প্রভৃতি আছে, তাদের মধ্যেও উচ্চ-নীচ মানা হয়। যেমন, গবাদি পশুকে শ্রেষ্ঠ মানা হয় এবং কুকুর, গাধা, শুয়োর প্রভৃতিকে নীচ মনে করা হয়। পায়রা প্রভৃতিকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়, আর কাক, চিল ইত্যাদি পাখীকে নীচ বলে মানা হয়। এদের সকলের অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতিও সমান বা একরকম দেখা যায় না। এর তাৎপর্য দাঁড়াল এই যে, ঊর্ধ্বগতি, মধ্যগতি এবং অধোগতিযুক্তদের মধ্যেও কয়েকরকমের জাতিভেদ ও পরিস্থিতি-ভেদ ঘটে থাকে।

জাতি কি জন্মানুসারে না কর্মানুসারে মানা উচিত ?

উচ্চ-নীচ যোনিতে যতরকম শরীর লাভ হয়, সেগুলি সবই গুণ ও কর্মানুসারেই লাভ হয়ে থাকে।

কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥ (গীতা ১৩।২১)

কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।

রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥ (গীতা ১৪।১৬)

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।

জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥ (গীতা ১৪।১৮)

গুণ এবং কর্ম অনুসারেই মানুষের জন্ম হয়, এই কারণেই মানুষের জাতিও জন্মানুসারেই মানা হয়। অতএব স্থূল দেহের দৃষ্টিতে বিবাহ, ভোজনাদি কর্ম জন্মের প্রাধান্য অনুসারেই করা উচিত অর্থাৎ আপন জাতি বা বর্ণানুসারেই ভোজন, বিবাহাদি কর্ম হওয়া কর্তব্য।

দ্বিতীয় কথা হল, যে প্রাণীর সাংসারিক ভোগ, ধন, মান, আরাম, সুখ ইত্যাদির উদ্দেশ্য থাকে, তার পক্ষে বর্ণানুসারে কর্তব্য কর্ম করা এবং বর্ণের মর্যাদানুরূপ চলাই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যদি সে বর্ণের মর্যাদাতে না চলে, তা হলে তার পতন ঘটে যায়। যেমন বশিষ্ঠস্মৃতিতে বলা হয়েছে—

আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা যদপ্যধীতাঃ সহ ষড়্‌ভিরঙ্গৈঃ।

ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ॥

অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দ, ব্যাকরণ ও জ্যোতিষ—এই ষড়ঙ্গসহিত অধীত বেদও আচারহীন পুরুষকে পবিত্র করতে পারে না। পাখা গজালে পাখী যেমন নিজের নীড় ত্যাগ করে, তেমনিই মৃত্যুকালে আচারহীন পুরুষকে বেদ ত্যাগ করে চলে যায়।

কিন্তু যার উদ্দেশ্য কেবল পরমাত্মা বা একমাত্র ভগবানই, সংসারের

ভোগাদি নয়, তার পক্ষে সৎসঙ্গ, স্বাধ্যায়, জপ, ধ্যান, কথা, কীর্তন, পরস্পর বিচার-বিনিময় প্রভৃতি ভগবৎ-সম্বন্ধীয় কাজই প্রধান হয়ে থাকে। তাৎপর্য হল এই যে, পরমাত্মলাভে, ভগবৎপ্রাপ্তিতে প্রাণিমাত্রের পারমার্থিক ভাব আচরণ প্রভৃতিরই মুখ্যতা বা প্রাধান্য, জাতি বা বর্ণের নয়।

তৃতীয় কথা, যার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হল ভগবৎপ্রাপ্তি, সে ভগবৎ-সম্বন্ধীয় কাজই প্রধানত করতে থেকেও বর্ণাশ্রম অনুসারে আপন কর্তব্যকর্মও পূজা-বুদ্ধিতে কেবল ভগবৎপ্রীতির জন্যই করে থাকে। সেইজন্য ভগবান বলেছেন—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ (গীতা ১৮।৪৬)

এই শ্লোকটিতে ভগবান এক পরম শ্রেষ্ঠ কথা বলে দিয়েছেন যে যাঁর থেকে নিখিল সংসার উৎপন্ন বা সৃষ্ট হয়েছে আর যাঁর দ্বারা এই সম্পূর্ণ সংসার পরিব্যাপ্ত, সেই পরমাত্মার প্রতিই লক্ষ্য রেখে তাঁরই প্রীত্যর্থে পূজারূপে আপন-আপন বর্ণানুসারে যেন কর্ম করা হয়। এতে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে। দেবতা, অসুর, পশু, পক্ষী প্রভৃতির স্বতঃ স্বাভাবিক অধিকার নেই কিন্তু তাঁদের জন্যও ভগবানের তরফ থেকে কোন নিষেধও নেই। তার কারণ হল সবাই পরমাত্মারই অংশ হওয়ার দরুণ পরমাত্মপ্রাপ্তিতে, ভগবানকে লাভ করতে সকলেই অধিকারী। প্রাণীমাত্রেরই ভগবানের উপর পূর্ণ অধিকার বা দাবী আছে।

এর থেকে এটিও সিদ্ধ হয়ে যায় যে পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে অর্থাৎ সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেমন খাওয়া-দাওয়া, বিবাহাদি এবং দেহাদির সম্পর্কের ব্যাপারে, সোজা কথায় হিন্দীতে যাকে বলা হয় 'রোটি-বেটী'র ব্যবহারে তো 'জন্মে'রই প্রাধান্য আর পরমাত্মপ্রাপ্তিতে ভগবানকে লাভ করার ক্ষেত্রে ভাব, বিবেক এবং 'কর্মে'রই প্রাধান্য। এই অভিপ্রায়েই ভাগবতকার বলেছেন যে, যে মানুষের বর্ণ বা জাতিকে নির্দেশ করার জন্য যে সব লক্ষণ বলা হয়েছে, তা যদি অন্য বর্ণ বা জাতির মধ্যেও পাওয়া যায়

তা হলে তাকেও সেই বর্ণের বা জাতির বলে ধরে নিতে হবে। যেমন এই শ্লোকে বলা হয়েছে—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১১।৩৫)

এর তাৎপর্য হল এই যে, ব্রাহ্মণের শম-দমাদি যত লক্ষণ আছে, সেইসব লক্ষণ বা গুণ যদি স্বভাবতই কারুর মধ্যে দেখা যায়, তা হলে সে জন্মানুসারে নীচ হলেও তাকে নীচ মনে করা উচিত নয়। ঠিক তেমনিই মহাভারতে যুধিষ্ঠির-নহুষ সংবাদে পাওয়া যায় যে, যে-শূদ্র আচরণে শ্রেষ্ঠ, সেই শূদ্রকে আর শূদ্র বলে মনে করা উচিত নয়, তেমনি যে-ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত কর্মশূন্য, সেই ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলে মান্য করা উচিত নয় অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে কর্মেরই প্রাধান্য গ্রহণ করা হয়েছে, জন্মের নয়। যেমন বলছেন মহাভারতে—

শূদ্রে তু যদ্ ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্বং বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্বং তং শূদ্রমিতি নির্দিশেৎ॥
(মহাভারত, বনপর্ব ১৮০।২৫-২৬)

শাস্ত্রে যে এই জাতীয় সব উক্তি দেখা যায়, সে সবের তাৎপর্য হল যে কোন নীচবর্ণের সাধারণের থেকে সাধারণ মানুষও আপন পারমার্থিক উন্নতি করতে পারে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কোন কারণ নেই। শুধু তাই নয়, সে সেই বর্ণে বা জাতিতে থেকেই শম-দমাদি যে সাধারণ ধর্ম আছে তা সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহিত পালন করতঃ আপন শ্রেষ্ঠতাকে প্রকট করতে পারে। জন্ম তো তার হয়েছে পূর্ব কর্ম অনুসারে, যেমন বলা হয়েছে পাতঞ্জল যোগসূত্রে— **'সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ'** (যোগদর্শন ২।১৩)। তাতে আর সে বেচারা কী করতে পারে ? কিন্তু সেখানেই অর্থাৎ

নীচ যোনিতে থেকেও সে নিজের নতুন উন্নতি সাধন করতে পারে। সেই উন্নতিতে উৎসাহিত করার জন্য শাস্ত্রবচনের এই তাৎপর্য বোঝা যায় যে নীচবর্ণের মানুষও যেন নতুন উন্নতি করার শক্তি বা উৎসাহ না হারায়।

যে উচ্চবর্ণের হয়েও বর্ণোচিত কাজ করে না, তাকেও আপন বর্ণোচিত কাজ করার জন্য শাস্ত্রে উৎসাহিত করা হয়েছে, যেমন ভাগবতের এই বাক্যটিতে স্মরণ করানো হয়েছে—

'ব্রাহ্মণস্য হি দেহোঽয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে'

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৭।৪২)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের এই যে দেহ তা ক্ষুদ্র কামনা পরিপূর্তির জন্য নয়।

যে-ব্রাহ্মণের খাওয়া-পরা, আচরণ সর্বথা ভ্রষ্ট, সে-ব্রাহ্মণকে কথা বা বচনের দ্বারাও সমাদর করা উচিত নয়—এমন কথাও স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে (দ্রষ্টব্য : মনুসংহিতা ৪।৩০।১৯২)। কিন্তু যাদের আচরণ শ্রেষ্ঠ, যারা ভগবানের ভক্ত সেই ব্রাহ্মণদের ভাগবতাদি পুরাণে এবং মহাভারত-রামায়ণাদি ইতিহাস-গ্রন্থে ভূয়সী মহিমা কীর্তিত হয়েছে।

ভগবানের ভক্ত যত নীচ জাতিরই হোন্ না কেন, তিনি ভক্তিহীন ব্রাহ্মণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এ বিষয়ে বিভিন্ন পুরাণে, মহাভারতাদিতে কতভাবে যে বলা হয়েছে তার সামান্য কিছু এখানে উদ্ধৃত করা হল—

(১) **অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্।**
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৩৩।৭)

অর্থাৎ আহা ! সেই চণ্ডালও সর্বশ্রেষ্ঠ, যার জিহ্বাগ্রভাগে তোমার নাম বিরাজিত। যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ তোমার নাম উচ্চারণ করেন, তিনি তপস্যা, যজ্ঞ, তীর্থদর্শন, সদাচার-পালন এবং বেদাধ্যয়ন সব কিছুই সমাধা করেছেন।

(২) **বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাচ্ছ্বপচং বরিষ্ঠম্।**
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৯।১০)

অর্থাৎ সেই বারোরকম গুণযুক্ত ব্রাহ্মণও যদি ভগবান কমলনাভের চরণ-কমলের প্রতি বিমুখই থেকে যায়, তা হলে সেই চণ্ডালও তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যে আপন মন-বচন-কর্ম-ধন ও প্রাণকে ভগবানে অর্পণ করে দিয়েছে। কারণ সে চণ্ডাল তো নিজের কুলকেও পবিত্র করে দেয়, অথচ শ্রেষ্ঠতার অহংকারযুক্ত ব্রাহ্মণ যে ভগবদ্‌বিমুখ, সে নিজেকেও পবিত্র করতে পারে না।

(৩) **চাণ্ডালোঽপি মুনেঃ শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।**
বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচোঽধমঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ হরিভক্তিতে মগ্ন চণ্ডালও মুনির চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর হরিভক্তিরহিত ব্রাহ্মণ চণ্ডালেরও অধম।

(৪) **অবৈষ্ণবাদ্ দ্বিজাদ্ বিপ্র চাণ্ডালো বৈষ্ণবো বরঃ।**
সগণঃ শ্বপচো মুক্তো ব্রাহ্মণো নরকং ব্রজেৎ॥
(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ব্রহ্মা. ১১।৩৯)

অর্থাৎ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের চেয়ে বৈষ্ণব চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ, কারণ সে বৈষ্ণব চণ্ডাল আপন বন্ধু আত্মীয়স্বজনগণ সহ মুক্ত হয়ে যায়, আর অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ নরকে পতিত হয়।

(৫) **ন শূদ্রা ভগবদ্‌ভক্তা বিপ্রা ভাগবতাঃ স্মৃতাঃ।**
সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে হ্যভক্তা জনার্দনে।। (মহাভারত)

অর্থাৎ যদি কোন ভগবদ্‌ভক্ত শূদ্র হয় তাহলে সে শূদ্র নয়, পরম শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। বাস্তবে সব বর্ণের বা জাতির মধ্যে সেই শূদ্র বলে পরিগণিত যে ভগবানে ভক্তিরহিত অর্থাৎ অভক্ত।

বেদের পুরুষসূক্তে বিরাট রূপের বর্ণনায় ব্রাহ্মণকে বিরাটরূপ ভগবানের মুখ, ক্ষত্রিয়কে হাত, বৈশ্যকে উরু বা মধ্যভাগ এবং শূদ্রকে পদ বা চরণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণকে মুখ বলার তাৎপর্য হল যে তাঁর কাছে জ্ঞানের পুঁজি আছে এবং সেই কারণে চার বর্ণ বা জাতিকেই পড়ানো, ভালো শিক্ষা দেওয়া, উপদেশ শোনানো—এ সব মুখের কাজ। এই দৃষ্টিতেই ব্রাহ্মণকে উচ্চ বা শ্রেষ্ঠ বলে মানা হয়েছে।

ক্ষত্রিয়কে হাত বলার অর্থ হল যে তারা চার বর্ণকেই শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে থাকে। রক্ষা করা মুখ্যতঃ হাতেরই কাজ। যেমন শরীরে যদি ফোড়া-ফুসকুড়ি ইত্যাদি হয় তাহলে হাত দিয়েই তাকে রক্ষা করা বা বাঁচানো হয়। তেমনি শরীরে চোট বা আঘাত এসে পড়লে বা লাগলে তা থেকে বাঁচার জন্য হাতেরই আড়াল দেওয়া হয়, আবার নিজেকে রক্ষা করা বা বাঁচানোর জন্যও অন্যের উপর হাত দিয়েই আঘাত করা হয়ে থাকে। মানুষ কোথাও পড়ে গেলে তার হাতই উঠবার অবলম্বন বা আশ্রয়রূপে থেকে যায়। এই সব কারণে ক্ষত্রিয় হয়ে গেলেন হাত। তবে অরাজকতা চারদিকে ছড়িয়ে গেলে ধন-জন ইত্যাদি রক্ষা করা চার বর্ণেরই ধর্ম বা মুখ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

বৈশ্যকে মধ্যভাগ বলার তাৎপর্য হল যে, যেমন পেটে অন্ন, জল, ঔষধাদি ঢেলে দেওয়া হয়, তা থেকে দেহের সর্বাবয়বেরই খোরাক বা খাদ্য মিলে যায় এবং সব অঙ্গ বা অবয়বই তাতে পুষ্ট হয়, ঠিক তেমনিই জিনিসপত্র সংগ্রহ করা, তাদের নিয়ে আসা নিয়ে যাওয়া, যেখানে যে জিনিসের ঘাটতি সেখানে সেই জিনিস পৌঁছে দেওয়া, জনগণের কোন জিনিসের অভাব না হতে দেওয়া—এ সব হল বৈশ্যের কাজ। পেটে অন্ন-জলের সংগ্রহ সারা শরীরের জন্যই করা হয়ে থাকে এবং সেইসঙ্গে পেটেরও পুষ্টি লাভ হয়। কারণ মানুষ কেবল পেটেরই জন্য পেটকে ভরায় না। ঠিক তেমনিই বৈশ্যও যেন অন্যের জন্যই সংগ্রহ বা অন্নাদি খাদ্যের জোগাড় করে, কেবল নিজের জন্য নয়। সে ব্রাহ্মণাদিকে দান করে, ক্ষত্রিয়দের অর্থাৎ রাজা বা সরকারকে ট্যাক্স্ দেয়, নিজের পালন করে এবং শূদ্রদের মজুরী, তাদের মেহনতের প্রতিদান দিয়ে থাকে। এইভাবে সে সকলের প্রতিপালন করে থাকে। সে যদি সংগ্রহ না করে, কৃষি, গোরক্ষা অর্থাৎ পশুপালন, বাণিজ্য না করে তো কী দেবে ? কোথা থেকে দেবে ?

শূদ্রকে চরণ বলে বর্ণনা করার অভিপ্রায় হল এই যে, যেমন চরণ সারা শরীরকে উঠিয়ে নিয়ে ঘোরায় ফেরায় এবং সম্পূর্ণ শরীরের সেবা চরণের

দ্বারাই হয়ে থাকে অর্থাৎ সব ভারই তারই উপর ন্যস্ত বা আরোপিত হয়, ঠিক তেমনিই সেবার আধার বা আশ্রয়ের উপরই চারটি বর্ণই চলে থাকে। শূদ্র আপন সেবা কর্মের দ্বারা সকলের আবশ্যক কার্য্যসমূহের পূর্তি বা পূরণ করে দেয়।

উপরে উক্ত বিবরণের মধ্যে একটি বিষয়ে মনোনিবেশ করা কর্তব্য যে গীতায় চার বর্ণেরই সেই সব স্বাভাবিক কর্মের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে কর্ম স্বতঃ বা স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে অর্থাৎ সেগুলি করতে অধিক পরিশ্রম হয় না। চার বর্ণেরই জন্য আরও অনেক কর্মের বিধান আছে। সেগুলির জন্য স্মৃতিশাস্ত্র দেখা উচিত এবং তদনুসারে আপন আচরণ-নির্ধারণ করা কর্তব্য। এই কথাই গীতায় বলা হয়েছে—

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি॥ (গীতা ১৬।২৪)

অর্থাৎ অতএব তোমার পক্ষে কর্তব্য-অকর্তব্যের ব্যবস্থা বা বিধানে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ—এইটি জেনে তোমার পক্ষে ইহলোক অর্থাৎ সংসারে শাস্ত্রবিধি অনুসারে নিয়ত বা নির্দিষ্ট কর্ম করা উচিত।

বর্তমান কালে বর্ণসমূহের মধ্যে বিশৃঙ্খলা বা ওলট্-পালট্ এসে যাওয়া সত্ত্বেও যদি চার বর্ণেরই সমূহকে একত্র করে আলাদা-আলাদাভাবে দলগতরূপে দেখা যায়, তা হলে ব্রাহ্মণ-সমুদায়ে অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের দলের মধ্যে শম-দমাদি গুণ যত বেশি পাওয়া যাবে, তত বেশি ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এবং শূদ্রদের দলে পাওয়া যাবে না। ক্ষত্রিয়দের সমুদায়ে বা গোষ্ঠীতে শৌর্য, তেজ ইত্যাদি গুণ যত বেশি মিলবে, তত ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-শূদ্র গোষ্ঠীতে মিলবে না। আবার বৈশ্যগণের মধ্যে ব্যবসা করা, অর্থ-উপার্জন করা, অর্থকে জমিয়ে রাখা, বাইরে থেকে অর্থের জৌলুস না দেখতে দেওয়া ইত্যাদি গুণ যত বেশি দেখা যাবে, তত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ও শূদ্রসমূহে পাওয়া যাবে না। তেমনি শূদ্রগণের মধ্যে সেবা করবার প্রবৃত্তি বা আগ্রহ যত বেশি দেখা যাবে তত কিন্তু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়- বৈশ্যের গোষ্ঠীতে মিলবে না। এর তাৎপর্য হল এই যে

আজ সব জাতিই মর্যাদাশূন্য এবং উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাদের যে স্বভাবজ কর্ম তা তাদের গোষ্ঠী বা সমুদায়ের মধ্যে বিশেষ ভাবে আজও দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ সে জিনিস ব্যক্তিগতভাবে দেখা না গেলেও সমষ্টিগতরূপে অর্থাৎ সাধারণভাবে সকলের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

যারা শাস্ত্রের গভীর রহস্য অবগত নন, তাঁরা বলে বসেন যে যেহেতু ব্রাহ্মণের হাতে লেখনী বা কলম ছিল, সেইজন্য তাঁরা 'ব্রাহ্মণই সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ' এইরকম লিখে ব্রাহ্মণদের সর্বোচ্চ করে দিয়েছেন। যাদের হাতে রাজ্য ছিল, তারা তখন ব্রাহ্মণদের বলল : 'কী হে মান্যবর ! আমরা কি কিছুই নই ?' তাতে ব্রাহ্মণেরা সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন : 'না, না, এমন কোন কথা নয়। আপনারাও আছেন, আমরাও আছি, আপনারা দু'নম্বরে আছেন', অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থানে। বৈশ্যরা ব্রাহ্মণদের বললেন : 'কী মহারাজ ! আমাদের বাদ দিয়ে কি আপনার জীবিকা অর্থাৎ জীবন-ধারণ চলবে ?' ব্রাহ্মণগণ বললেন : 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনারাও আছেন বই কি, তিন নম্বরে।' যাদের কাছে না ছিল রাজ্য, না ধনদৌলত, তারাও যখন উঁচুতে উঠতে লাগল অর্থাৎ উন্নত হতে লাগল, তখন ব্রাহ্মণেরা বলে দিলেন তাদের 'আপনাদের ভাগ্যে রাজ্য বা ধনসম্পদ লেখা নেই, আপনারা এই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যদের সেবা করুন। সেইজন্য আপনারা চার নম্বরে আছেন।' এইভাবে সকলকে ভুলিয়ে বিভ্রান্তিতে ফেলে রাজ্য এবং ধনসম্পদের প্রভাবে নিজেদের একতা এনে অর্থাৎ দল বেঁধে চতুর্থ বর্ণ অর্থাৎ শূদ্রকে পদদলিত করে দিয়েছেন—এইভাবে যাঁরা এসব লিখেছেন তা একান্তভাবেই আপন স্বার্থ, সঙ্কীর্ণতা ও অহংকার বশেই রচনা করে রেখেছেন।

এর সমাধান হল এই যে ব্রাহ্মণেরা কোথাওই নিজস্ব ব্রাহ্মণধর্মের জন্য এমন কথা লেখেননি যে ব্রাহ্মণ হল সবার উপরে, সেইজন্য তাঁর বড় আরামে থাকা উচিত, ধনসম্পদে যুক্ত হয়ে ফূর্তি করা উচিত ইত্যাদি। বরং উল্‌টো ব্রাহ্মণদের জন্য এই বিধানই দেওয়া হয়েছে যে তাঁদের ত্যাগ করতে হবে, কষ্ট সহন করতে হবে, তপশ্চর্যা করতে হবে। গার্হস্থ্য অবস্থায়

থাকাকালীন ব্রাহ্মণের পক্ষে ধন-সংগ্রহ করা উচিত নয়। এমন কি অন্নের সংগ্রহও স্বল্প পরিমাণে করা কর্তব্য। 'কুম্ভীধান্য' অর্থাৎ মাত্র এক কলসী ভরা ধান্যাদি শস্য থাকবে তার। লৌকিক অর্থাৎ জাগতিক ভোগে আসক্তি হওয়া উচিত নয় এবং জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য কারুর কাছ থেকে যদি দান গ্রহণ করাও হয় তবে তা যেন তার কাজ করে দিয়েই অর্থাৎ যজ্ঞ, হোম, জপ, পাঠ ইত্যাদি কিছু কাজ করেই তবে নেওয়া হয়। গোদান ইত্যাদি যদি গ্রহণ করা হয়, তা হলে তার প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।

যদি কেউ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ দিতে চায় তো তা যেন শ্রাদ্ধের প্রথম দিন অর্থাৎ আগের দিন দেয়, যাতে ব্রাহ্মণ তার পিতৃপুরুষকে নিজের মধ্যে আবাহন করে এনে রাত্রিকালে ব্রহ্মচর্য ও সংযমাদি পালন করে থাকতে পারে। দ্বিতীয় দিন সে যজমানের পিতৃপুরুষদের পিণ্ডদান, তর্পণাদি ঠিক বিধিবিধান অনুসারে যেন করায়। তারপর সেখানে ভোজন করে। নিমন্ত্রণও যেন একজন যজমানেরই গ্রহণ করে এবং ভোজনও একটি বাড়ীতেই যেন করে। শ্রাদ্ধের অন্ন খাওয়ার পর নাম-জপাদি করে শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। দান-গ্রহণ, শ্রাদ্ধ- ভোজন করা, এসব ব্রাহ্মণের উচ্চশ্রেণীর লক্ষণ নয়। ব্রাহ্মণের উচ্চশ্রেণী নির্ধারিত হয় ত্যাগে। তাঁরা কেবল যজমানের পিতৃপুরুষদের কল্যাণ-কামনায় সেই ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই শ্রাদ্ধে ভোজন ও দক্ষিণাদি গ্রহণ করে থাকেন, কোন স্বার্থ-ভাবনায় প্রেরিত হয়ে নয়। সেই কারণে এটিও তাঁর ত্যাগেরই অন্তর্গত।

ব্রাহ্মণগণ আপন জীবিকার জন্য ঋত, অমৃত, মৃত, সত্যানৃত এবং প্রমৃত —এই পাঁচটি বৃত্তির কথা বলেছেন। যেমন মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে—

ঋতামৃতাভ্যাং জীবেৎ তু মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন ॥ (মনুস্মৃতি ৪।৪)

অর্থাৎ ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত এবং সত্যানৃত—এগুলির মধ্য থেকে যে কোন বৃত্তি দ্বারা যেন জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, কিন্তু শ্ববৃত্তি অর্থাৎ সেবা বা দাসত্ববৃত্তি দ্বারা কখনও নয়।

(১) ঋতবৃত্তিকেই সর্বোচ্চ বৃত্তি বলে গণ্য করা হয়েছে। একে শিলোঞ্ছ বৃত্তি বা কপোতবৃত্তিও বলা হয়। যারা চাষবাস করে, তারা খেত থেকে ধান কেটে নিয়ে যাবার পর সেখানে মাটিতে যে অন্ন অর্থাৎ ভূষি বা খুদ কণিকা পড়ে থাকে, তা হল ব্রাহ্মণের, সেই অর্থেই তাঁদের 'ভূদেব' বলা হয়। অতএব সেইগুলি বেছে বা খুঁটে তুলে নিয়ে তাই দিয়ে জীবন-নির্বাহ করার নাম 'শিলোঞ্ছবৃত্তি'। অথবা ধানের গোলায় যেখানে ধান মাপা হয়, সেখানেও মাটিতে যে সব দানা শস্যকণা পড়ে থাকে, সেগুলিও ভূদেবদেরই প্রাপ্য হয়ে থাকে। অতএব সেগুলি বেছে তুলে নিয়ে জীবন-নির্বাহ করাই হল 'কপোতবৃত্তি'।

(২) কোনোভাবে না চেয়েও, বিনা যাচনায় এবং বিনা ইঙ্গিতে বা ইশারায় যদি কোন যজমান এসে কিছু দিয়ে যায়, তা হলে তা থেকে শুধু জীবন-যাত্রা নির্বাহের জন্য যেটুকু দরকার সেই জিনিসটুকু নেওয়া হল 'অমৃত-বৃত্তি'। একে 'অযাচিত বৃত্তি'ও বলা হয়।

(৩) সকালে ভিক্ষার জন্য গ্রামে যাওয়া এবং সেখানকার লোকদের বার, তিথি, মুহূর্তাদির কথা অর্থাৎ কখন ভালো সময় ইত্যাদি নির্দেশ করে, এইভাবে কাজ করে দিয়ে তার বিনিময়ে ভিক্ষায় যা কিছু পাওয়া যায়, তাই দিয়ে জীবন-নির্বাহ করার নাম 'মৃত-বৃত্তি'।

(৪) ব্যবসা করে জীবন-নির্বাহ করা হল 'সত্যানৃত বৃত্তি'।

(৫) যদি উপযুক্ত চাররকমের বৃত্তি দ্বারা জীবন-যাপন সম্ভব না হয়, তা হলে যেন চাষবাস করে, কিন্তু তা ও কঠোর বিধি-বিধান অনুসারে। যেমন, একটি বলদকে দিয়ে যেন হল-কর্ষণ না করায়, রোদের মধ্যে লাঙ্গল না চালায় ইত্যাদি অর্থাৎ কাউকে কোনরকম কষ্ট না দিয়ে তবে যেন চাষ করে। এই হল 'প্রমৃতবৃত্তি'।

উপরে যে পাঁচটি বৃত্তি বা জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপজীবিকার কথা হল, তার মধ্য থেকে যে কোন একটি অবলম্বন করে যদি জীবন-নির্বাহ করা হয়, তা হলেও পঞ্চ মহাযজ্ঞ, অতিথি-সেবা করিয়ে তবে যজ্ঞশেষ

ভোজন করা উচিত। এক্ষেত্রে উল্লেখনীয় যে—

ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের সম্বন্ধে এই নিষেধ করা হয়েছে যে তারা যেন কখনও শ্ববৃত্তি বা সেবাবৃত্তির আশ্রয় না নেয় অর্থাৎ তা অবলম্বন না করে। সেইজন্যই মনু বলেছেন—**'ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন'** (মনুস্মৃতি ৪।৪)। আরও বলেছেন —**'সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাৎ তাং পরিবর্জয়েৎ'** (মনুস্মৃতি ৪।৬)। এখানে বস্তুতঃ 'সেবাবৃত্তি'র নিষেধ করা হয়েছে, সেবার নয়। মাতা-পিতার মতো অত্যন্ত নীচ বর্ণের যতরকম নীচ সেবাও তাঁরা করতে পারেন। নীচবর্ণের সেবা দ্বারা তাঁদের মহত্ত্বই প্রকাশ পায়। এইজন্য এখানে বৃত্তিরই নিন্দা করা হয়েছে। মান-মর্যাদা-উপার্জনাদির স্বার্থে সেবা নয়, তারই নিন্দা করা হয়েছে। স্বার্থত্যাগ করে সেবার নিন্দা এখানে অভিপ্রেত নয়। সেবাকে চাকরী বা দাসত্বে পরিণত কোরো না, বৃত্তি বা পেশা করে তুলো না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে নিয়ে যদি এ বিষয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হন, তাহলে দেখতে পাবেন যে ব্রাহ্মণের পক্ষে পালনীয় স্বাভাবিক যে নয়টি ধর্মের উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে জীবিকা-উৎপাদক অর্থাৎ রোজগারমূলক একটি ধর্মও নেই। ক্ষত্রিয়ের জন্য সাতটি স্বাভাবিক ধর্ম বলা হয়েছে। তার মধ্যে যুদ্ধ করা এবং শাসন করা—এই দুটি ধর্ম কিছু জীবিকা-উৎপাদক বলা চলে। বৈশ্যের জন্য যে তিনটি ধর্ম বলা হয়েছে—কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য—এ তিনটিই সম্পদ উৎপাদন কর্ম। শূদ্রের জন্য একমাত্র সেবাকেই ধর্ম বলা হয়েছে, যাতে শুধু উপার্জনই হয়ে থাকে। শূদ্রের খাওয়া-পরা, জীবন-নির্বাহের জন্যও অনেক অতিরিক্ত সাহায্য বা ছাড় দেওয়া হয়েছে।

ভগবান **'স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ'** (গীতা ১৮।৪৫) শ্লোকের এই পদগুলির মধ্য দিয়ে কী অপরূপ বিচিত্র কথাই না শুনিয়েছেন ! শম-দমাদি নয়টি ধর্মপালন করার ফলে ব্রাহ্মণের যে কল্যাণ লাভ হয়, সেই কল্যাণই শৌর্য, তেজ ইত্যাদি সাতটি ধর্ম পালনের দ্বারা ক্ষত্রিয়ের হয়ে থাকে, আবার কৃষি-গোরক্ষা-বাণিজ্যরূপ ধর্ম পালনের দ্বারা

বৈশ্যও সেই কল্যাণই প্রাপ্ত হয় এবং সেই একই কল্যাণ শূদ্র কেবল সেবা দ্বারা পেয়ে যায়।

এরপরে ভগবান আর এক সর্ববিলক্ষণ কথা শুনিয়েছেন যে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র আপন-আপন বর্ণোচিত কর্মসমূহের দ্বারা সেই পরমাত্মার পূজা বা অর্চনা করে পরম সিদ্ধি লাভ করে থাকে—**'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ'** (গীতা ১৮।৪৭)। বাস্তবে কল্যাণ বর্ণোচিত কর্ম দ্বারা হয় না, হয় শুধু নিষ্কামভাবে পূজনের দ্বারাই। শূদ্রের তো স্বাভাবিক কর্মই পরিচর্যাত্মক বা সেবারূপ অর্থাৎ পূজনরূপ, অতএব তার পূজনের দ্বারা পূজন অর্থাৎ দ্বিগুণ পূজা সম্পাদিত হয়ে যায়। সেই কারণে তার কল্যাণ বা মঙ্গল যত শীঘ্র ঘটবে, অত শীঘ্র ব্রাহ্মণাদির হবে না।

শাস্ত্রকারগণ উদ্ধারের ব্যাপারে ছোটদের বেশি আদর দিয়েছেন। কারণ ছোটরাই আদরের পাত্র হয়ে থাকে এবং বড় অধিকারের পাত্র অর্থাৎ বেশি পাওয়ার যোগ্যরূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। বড়োর উপর চিন্তা-ভাবনার ভার বেশি থাকে, ছোটদের কিছুমাত্রও ভাবনার ভার থাকে না। শূদ্রকে ভাবরহিত করে দিয়ে তার জীবিকা নির্দেশ করা হয়েছে এবং প্রীতি-ভালবাসা-আদরও দেওয়া হয়েছে।

বাস্তবে যদি দেখা যায় তা হলে প্রতীতি হয় যে, বর্ণ-আশ্রমে যে বর্ণ যত উঁচুতে অবস্থিত হয়, তারজন্য শাস্ত্র অনুসারে ততই কঠিন সব নিয়ম-কানুন বিহিত বা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। সেই সব নিয়মের খুঁটিনাটি পালন করতে গিয়ে বিশেষ কষ্ট পেতে হয়। কিন্তু বর্ণ-আশ্রমে যে নীচের পর্যায়ে থাকে, তার কল্যাণ অনেক সুগম, অনেক অনায়াসে সাধিত হয়। এই বিষয়ে বিষ্ণু-পুরাণে এক কাহিনী পাওয়া যায়—

একবার অনেক ঋষি-মুনিরা একত্র হয়ে শ্রেষ্ঠতার নির্ণয়ের জন্য ভগবান বেদব্যাসের কাছে গেলেন। ব্যাসদেব সকলকে সমাদরপূর্বক বসালেন এবং নিজে চলে গেলেন গঙ্গায় স্নান করতে। গঙ্গায় স্নান করতে করতে তিনি বলে উঠলেন : 'অহো কলিযুগ ! তুমি ধন্য। হে স্ত্রীগণ ! তোমরা ধন্য। হে

শূদ্রগণ ! তোমরা ধন্য।' যখন ব্যাসদেব স্নান সেরে ঋষিদের কাছে এলেন, তখন ঋষিগণ বললেন—'মহারাজ ! আপনি কলিযুগ, স্ত্রীগণ এবং শূদ্রগণকে কি বলে ধন্য ধন্য করলেন ?' তখন তিনি বললেন যে, কলিযুগে আপন ধর্ম পালন করলে স্ত্রীলোকদের এবং শূদ্রদের দ্রুত এবং অনায়াসে কল্যাণ লাভ হয়ে যায়।

এখানে আর একটি কথাও ভাববার আছে এই যে, আপন স্বার্থের জন্য যে কাজ করে, সে সমাজে ও সংসারে আদরের পাত্র হয় না। শুধু সমাজেই নয়, বাড়ীতেও যে লোক পেটুক ও লোভী হয়, অন্যেরা তার নিন্দা করে থাকেন। ব্রাহ্মণেরা কেবল স্বার্থদৃষ্টিতেই আপন মুখে প্রশংসা বা শ্রেষ্ঠতার কথা বলেন নি। তাঁরা ব্রাহ্মণদের জন্য ত্যাগেরই নির্দেশ করেছেন। সাত্ত্বিক মানুষ কখনও নিজের প্রশংসা করেন না, বরং অন্যের প্রশংসা, অন্যের সমাদরই করে থাকেন। তাৎপর্য হল এই যে ব্রাহ্মণেরা আপন স্বার্থ ও অহংকারের কথা, আত্মাভিমানের কথা বলেননি। যদি তাঁরা স্বার্থ ও আত্মাভিমানের কথাই বলতেন, তা হলে এত শ্রদ্ধেয়, সমাদরের পাত্র হতেন না এবং শাস্ত্রেও আদৃত হতেন না। তাঁরা যে সমাদর পেয়ে থাকেন, তা কেবল ত্যাগের জন্যই।

এইভাবে সব মানুষের কর্তব্য শাস্ত্রের গভীর অধ্যয়ন করে তবেই উপযুক্ত সব বিষয়ে বোঝার চেষ্টা করা এবং ঋষি-মুনিদের উপর, শাস্ত্রকারদের উপর বৃথা আক্ষেপ বা মিথ্যা দোষারোপ না করা।

উচ্চ-নীচ বর্ণে বা জাতিতে প্রাণিগণের জন্ম প্রধানত গুণ ও কর্মানুসারেই হয়ে থাকে—'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ' (গীতা ৪।১৩)। কিন্তু ঋণে আবদ্ধ থাকার দরুণ বা শাপ, বরদান, সঙ্গ ইত্যাদি কারণবিশেষেও উচ্চ-নীচ বর্ণে জন্ম হয়ে যায়। সেইসব বর্ণে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও সে আপন পূর্ব স্বভাব অনুসারেই আচরণ করে থাকে। এই কারণেই উচ্চ বর্ণে উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও কারুর মধ্যে নীচ আচরণ দেখা যায়, যেমন ধুন্ধুকারী প্রভৃতির। আবার নীচ বর্ণে জন্মানো সত্ত্বেও অনেকে মহাপুরুষ হয়ে

থাকেন, যেমন বিদুর, কবীর, রৈদাস প্রভৃতি।

আজ যে সমুদায়ে অর্থাৎ সকলের মধ্যে সমষ্টিগতভাবে জাতিগত, কুলপরম্পরাগত, সমাজগত ও ব্যক্তিগত যা কিছু শাস্ত্র বিপরীত দোষ এসে পড়েছে, সে সব আপন বিবেক বিচার, সৎসঙ্গ, স্বাধ্যায় প্রভৃতি দ্বারা দূর করে নিজের মধ্যে স্বচ্ছতা, নির্মলতা, পবিত্রতা আনা চাই, যাতে মনুষ্য-জন্মের ধ্যেয় বা লক্ষ্য সিদ্ধ হতে পারে।

আপন কর্মসমূহের দ্বারা ভগবানের পূজা

মনুস্মৃতিতে ব্রাহ্মণদের জন্য ছয়টি কর্ম বলা হয়েছে—নিজে পড়া, অন্যকে পড়ানো, স্বয়ং যজ্ঞ করা এবং অন্যদের দ্বারা যজ্ঞ করানো, তথা স্বয়ং দান গ্রহণ করা এবং অন্যদের দান দেওয়া—

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহং চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥ (মনুস্মৃতি ১।৮৮)

এর মধ্যে পড়ানো, যজ্ঞ করানো এবং দান নেওয়া—এই তিনটি কর্ম জীবিকার জন্য এবং পড়া, যজ্ঞ করা ও দান দেওয়া—এই তিনটি হল কর্তব্য কর্ম।

উপযুক্ত ছয়টি শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্ম এবং শম-দমাদি নয়টি স্বভাবজ কর্ম এবং এতদতিরিক্ত খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা ইত্যাদি যতরকম কর্ম আছে, সেই সমস্ত কর্মসমূহের দ্বারা ব্রাহ্মণ চার বর্ণে ব্যাপ্ত বা বিরাজমান ভগবানের পূজা করবে। এর তাৎপর্য হল এই যে পরমাত্মা বা ভগবানের আজ্ঞায় তাঁর প্রসন্নতার জন্য ভগবদ্‌বুদ্ধিতে নিষ্কাম ভাবপূর্বক সকলের সেবা করবে।

তেমনি ক্ষত্রিয়দের জন্য পাঁচটি কর্ম বলা হয়েছে—প্রজাগণের রক্ষা, দান দেওয়া, যজ্ঞ করা, অধ্যয়ন করা এবং বিষয়ে আসক্ত না হওয়া—

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥ (মনুস্মৃতি ১।৮৯)

এই পাঁচটি কর্ম এবং শৌর্যাদি সাতটি স্বভাবজ কর্মসমূহের দ্বারা তথা খাওয়া-পরা-চলা-ফেরা প্রভৃতি সব কর্মের দ্বারা ক্ষত্রিয় সর্বত্র ব্যাপক পরমাত্মার পূজা করবে।

আবার বৈশ্য—যজ্ঞ করা, অধ্যয়ন করা , দান দেওয়া এবং সুদ নেওয়া তথা কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য—

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।

বণিক্পথং কুসীদং চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥ (মনুস্মৃতি ১।৯০)

এই সব শাস্ত্রনির্দিষ্ট এবং স্বভাবজ কর্মের দ্বারা ভগবানের পূজা করবে। শেষ, শূদ্র—শাস্ত্রবিহিত তথা স্বভাবজ কর্ম, সেবা দ্বারা সর্বত্র বিরাজমান ভগবানের যেন পূজা করে—

একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ।

এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া ॥ (মনুস্মৃতি ১।৯১)

অর্থাৎ আপন শাস্ত্রবিহিত, স্বভাবজ এবং খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া-জাগা আদি সবরকম কর্মের দ্বারা ভগবানের আজ্ঞায়, ভগবানের প্রসন্নতার জন্য ভগবদ্বুদ্ধিতে নিষ্কামভাবপূর্বক যেন সকলের সেবা করে।

শাস্ত্রে মানুষের জন্য আপন বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে যে যে কর্তব্য কর্মের কথা বলা হয়েছে, সে সবই সংসাররূপী পরমাত্মার, জগদ্রূপী ভগবানের পূজার জন্যই বিহিত হয়েছে। যদি সাধক আপন কর্মের দ্বারা ভাবের সঙ্গে ভগবানের পূজা করে, তা হলে তার ক্রিয়ামাত্রই অর্থাৎ সব কাজই ভগবানের পূজা হয়ে যায়। যেমন, পিতামহ ভীষ্ম অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় অর্জুনের সারথিরূপে বসেছিলেন যে ভগবান, তাঁকে আপন যুদ্ধরূপ কর্মের দ্বারা (বাণ দিয়েই) পূজা করেছিলেন। ভীষ্মের শরাঘাতে ভগবানের কবচ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। যার ফলে তাঁর দেহও ক্ষত-বিক্ষত হল, হাতের আঙুলেও ছোট ছোট বাণ বিদ্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে লাগাম ধরাও কঠিন ও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল। এমনিভাবে পূজা করার পর অন্তকালে শরশয্যায় শয়ান পিতামহ ভীষ্ম আপন বাণের দ্বারা পূজিত সেই ভগবানের ধ্যান করেছেন এই বলে : 'যুদ্ধের সময় আমার তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা যাঁর কবচ ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, যাঁর ত্বক অর্থাৎ গায়ের চামড়াও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, পরিশ্রমের দরুণ যাঁর মুখমণ্ডলে স্বেদকণিকা, ঘর্মবিন্দু ফুটে উঠে তা সুশোভিত করেছে, ঘোড়ার খুরের দ্বারা উত্থিত উড়ে আসা ধূলিরাশি যাঁর সুন্দর অলকাবলীতে লেগে আছে, এইভাবে বাণের দ্বারা অলঙ্কৃত ভগবান

কৃষ্ণে আমার মন-বুদ্ধি যেন লগ্ন হয়ে যায়।'

যুধি তুরগরজোবিধূম্রবিষ্বক্‌কচলুলিতশ্রমবার্যলঙ্কৃতাস্যে।
মম নিশিতশরৈর্বিভিদ্যমানত্বচি বিলসৎকবচেঽস্তু কৃষ্ণ আত্মা॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১।৯।৩৪)

লৌকিক এবং পারমার্থিক কর্মের দ্বারা সেই পরমাত্মার পূজা তো অবশ্যই কর্তব্য কিন্তু সেই কর্মসমূহে এবং তা নিষ্পাদন করার করণ ও উপকরণে মমতা রাখা উচিত নয়। তার কারণ যে সব বস্তুতে ও ক্রিয়াদিতে মমতা জন্মে যায়, সে সব বস্তুই অপবিত্র হয়ে যাওয়ার দরুণ আর পূজার জিনিস থাকে না (যেমন অপবিত্র ফল, ফুল ইত্যাদি ভগবানকে দেওয়া চলে না)। শ্রীরামচরিতমানসেও একথা বলা হয়েছে যে—

মমতা মল জরি জাই।

অর্থাৎ মমতারূপ মালিন্যে বস্তু অশুদ্ধ হয়ে পড়ে।

সেই কারণে আমার কাছে যা কিছু আছে, এ সবই সেই সর্বব্যাপক পরমাত্মারই, আমাকে তো কেবল নিমিত্তমাত্র হয়ে তাঁরই দেওয়া শক্তিতে তাঁরই পূজা করতে হবে—এই ভাব নিয়ে যা কিছু করা যায়, তার সব কিছুই, সম্পূর্ণভাবে সমস্তই ভগবানের পূজা হয়ে যায়। এর বিপরীতে অর্থাৎ উলটো ভাবে সেই ক্রিয়া-কলাপ ও বস্তুসমূহকে মানুষ যত আপনার বা নিজের বলে মনে করে বা ধরে নেয়, ততই ঐসব আপন বলে মনে করা সেই ক্রিয়াসমূহ ও বস্তুসমূহ অপবিত্র হয়ে যাওয়ার দরুণ পরমাত্মার বা ভগবানের পূজা থেকে বঞ্চিতই রয়ে যায়।

(গীতা সাধক-সঞ্জীবনী গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ের চুয়াল্লিশতম শ্লোকের ব্যাখ্যা থেকে)

সমতা আসবে কেমন করে ?

আজকাল সমতা নিয়ে খুব চর্চা হচ্ছে, আলোচনা চলছে। সকলের সঙ্গে সমভাবে ব্যবহার করো—এইরকম প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবিক সমতা কাকে বলে এবং তা কখন আসে বা হয়—এইটি বোঝা বিশেষ প্রয়োজন।

সমতা কোন হাসি-ঠাট্টা বা খেলার জিনিস নয়, এ হল পরমাত্মার সাক্ষাৎ স্বরূপ। যাঁদের মন সমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাঁরা জীবৎকালেই সংসারের উপর বিজয় লাভ করেন এবং পরব্রহ্ম পরমাত্মার অনুভব প্রাপ্ত হয়ে যান। যেমন গীতায় বলা হয়েছে—

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ (গীতা ৫।১৯)

অর্থাৎ এখানেই, এই জীবিত অবস্থাতেই সৃষ্টিকে জয় করে নিয়েছেন তাঁরা, যাঁদের সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মন। নির্দোষ অর্থাৎ নিখুঁত পরিপূর্ণ সম হলেন যেহেতু একমাত্র ব্রহ্ম, অতএব তাঁরা ব্রহ্মেই স্থিত বা প্রতিষ্ঠিত।

এই সমতা তখনই আসে যখন অন্যের দুঃখ নিজের দুঃখ এবং অন্যের সুখ নিজের সুখ হয়ে যায়। গীতায় ভগবান বলেছেন—

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ (গীতা ৬।৩২)

অর্থাৎ 'হে অর্জুন ! যে মানুষ আপন শরীরের মতো সব জায়গায় সমান ভাবে দেখে এবং সুখ অথবা দুঃখকেও সর্বত্র সমভাবে দেখে বা উপলব্ধি করে, তাকেই শ্রেষ্ঠ যোগী বলে গণ্য করা হয়।'

যেমন শরীরের যে কোন অঙ্গে পীড়া বা বেদনা হলে তাকে দূর করার জন্য প্রচেষ্টা শুরু হয়ে যায়, ঠিক তেমনিই যে কোন প্রাণীর দুঃখ-সন্তাপাদি হলে পর তাকে দূর করার জন্য যদি একান্ত আগ্রহ জন্মে, তা হলেই সমতা

লাভ হয়, তবেই সমতা এসে যায়। সাধু-মহাত্মাদের লক্ষণেও তাই পাওয়া যায়—

'পর দুখ দুখ সুখ সুখ দেখে পর' (শ্রীরামচরিতমানস ৭।৩৮।১)

যতক্ষণ নিজের সুখের জন্য লালসা বা কামনা আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যতই চেষ্টা করা যাক্, সমতা আসবে না। কিন্তু যেই হৃদয়ে এমন আকাঙ্ক্ষা জেগে যায় যে অন্যকে কেমন করে সুখ পৌঁছে দেওয়া যায় অর্থাৎ সুখলাভ করানো যায় ? তাদের আরাম হয় কিসে ? তাদের লাভ হয় কিভাবে ? তাদের কল্যাণ বা মঙ্গল হয় কেমন করে ? তখনই সমতা আপনি এসে যায়। এর আরম্ভ করতে হয় সর্বপ্রথম আপন ঘর অর্থাৎ নিজের বাড়ী থেকে। হৃদয়ে যেন এমন ভাব সদা জাগ্রত থাকে যে কারুর যেন কিছুমাত্র দুঃখ বা কষ্ট না পেতে হয়, কারুর কখনও কোন অনিষ্ট না হয়। আমি নিজে যতই না কেন কষ্ট পাই কিন্তু আমার মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, ভাই-ভ্রাতৃবধূ ইত্যাদির কেবল যেন সুখই লাভ হয়। বাড়ীর সকলকে সুখ এনে দিতে পারলে নিজের মনে শান্তি আসবেই। আর যেখানে নিজের বাড়ীরও কোন সম্বন্ধ নেই, সেখানে সুখ পৌঁছে দিতে পারলে তো বিশেষ আনন্দের তরঙ্গ বইতে থাকবে। কিন্তু মমতার বশে সুখ লাভ করাতে গেলে আমার কোন উন্নতি হবে না। যেখানে আমার মমতা নেই, সেখানে যদি সুখ পাইয়ে দিতে পারি অথবা যেখানে আমি মমতার বশে সুখ পৌঁছে দিই বা প্রাপ্ত করাই, সেখান থেকে নিজের মমতা যদি সরিয়ে নিতে পারি, তাহলে দুইয়েরই পরিণাম বা ফল একই হবে। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই মমতাশূন্যতাই হবে আপন উন্নতি বা শান্তির একমাত্র কারণ।

চিত্রকূটে লক্ষ্মণ যখন ভগবান রামচন্দ্র ও সীতার সেবা করছেন, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে গোস্বামী তুলসীদাস বলছেন—

সেবহিঁ লখনু সীয় রঘুবীরহি। জিমি অবিবেকী পুরুষ সরীরহি॥

(শ্রীরামচরিতমানস ২।১৪২।১)

অর্থাৎ ভগবান লক্ষ্মণ ভগবান রামচন্দ্র ও সীতার তেমনি সেবা

করছিলেন, ঠিক যেমন অজ্ঞানী পুরুষ আপন শরীরের সেবা করে থাকে। নিজের শরীরের তোয়াজ করা, তাকে সুখ পাইয়ে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আপন শরীরের সেবা তো পশুতেও করে। যেমন দেখা যায়, কোন বাঁদরীর নিজের বাচ্চার উপর এত মমতা থাকে যে বাচ্চা মরে গেলেও সে তার দেহকে আঁকড়ে ধরে নিয়েই চলতে থাকে, ছাড়ে না। কিন্তু যখন কোন খাবার জিনিস মিলে যায়, তখন সে নিজেই সেটা খেয়ে নেয়, বাচ্চাকে আর দেয় না খেতে। বাচ্চা যদি খাওয়ার চেষ্টা করে তাকে সে এমন গুঁতো মারে যে সে বেচারা চীঁ-চীঁ করতে করতে দূরে পালিয়ে যায়। তাই মমতা থাকতে সমতা আনা অসম্ভব।

যার কাছ থেকে আমার কিছু নেবার নেই, যার সঙ্গে আমার কোন স্বার্থের লেনদেনের ব্যাপার নেই, তেমন লোকের সঙ্গেও আমার এমন প্রীতিপূর্ণ, ভালোর চেয়ে ভালো ব্যবহার করা উচিত যাতে তার ভালো হয়, তার হিতই সাধিত হয়। কোনও এক লোক রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে, সে রাস্তা চেনে না এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করছে। তখন আমি যদি পরম প্রসন্ন চিত্তে রাস্তা বলে দিই অথবা কিছু দূর পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিই সঙ্গে চলে, তা হলে আমার হৃদয়ে প্রত্যক্ষ সুখ ও শান্তির অনুভব হবে। কিন্তু জানা সত্ত্বেও তাকে যদি আমি পথ না বলে দিই, তা হলে আমার মনে সুখ হবেনা কখনোই। এ হল অনুভবের, প্রত্যক্ষ উপলব্ধির কথা, যে কেউ করে দেখতে পারে। কারুর পিপাসা লেগেছে তা হলে তাকে বলে দাও যে ভাই! এদিকে এসো, এখানে ঠাণ্ডা জল আছে। তারপর আপন হৃদয়ের দিকে যদি দেখো উপলব্ধি করবে হৃদয়ে বড় প্রসন্নতা, বড় সুখ আসবে। এ সুখ আমার কল্যাণকারী। অন্যে বা অপরে দুঃখ পায় তো পাক্ কিন্তু আমি সুখটুকু ভোগ করে নিই— এ সুখ হল পতনকারক। এর থেকে না আমার কোন ব্যবহারিক উন্নতি হবে, না পারমার্থিক। আমরা সৎসঙ্গের আয়োজন করে থাকি। তাতে যারা যোগ দিতে আসবেন, সেইসব লোকদের বসবার ব্যবস্থা যদি করি তাহলে পরম সমাদরে যেন বলি, আসুন, এইখানে বসুন। তাঁকে যেন সেইখানে বসাই,

যেখান থেকে তিনি ঠিকমত শুনতে পান। তিনি আরাম করে যাতে বসতে পারেন, ঠিকমত যাতে শুনতে পারেন, এইভাব নিয়ে যেন তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করি। এইভাবে করলে আমাদের হৃদয়ে প্রত্যক্ষ শান্তির অনুভব লাভ হবে। কিন্তু সেখানেই যদি হুকুম চালাই যে এ কী করছ ? এদিকে বোসো, এদিকে নয়, তাহলে ব্যাপারটা এক থাকলেও হৃদয়ে শান্তি আসবে না। ভিতরে যে আত্মাভিমান বা অহংকার, তা অন্যদের আঘাত করবে, খারাপ লাগবে। যদি এইরকম ব্যবহার করে আর এদিকে চায় যে সমতা এসে যাক্, তা কখনও আসবে না।

সকলের হিতে যার প্রীতি বা অনুরাগ এসে গিয়েছে, সে ভগবানকে লাভ করে থাকে, তাঁকে প্রাপ্ত হয়ে যায়—**'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ'** (গীতা ১২।৪)। তার কারণ হল, ভগবান হলেন প্রাণিমাত্রের পরম সুহৃদ (গীতা ৫।২৯)। তিনি প্রাণিমাত্রের পালন-পোষণ করে থাকেন। আস্তিকের চেয়েও আস্তিক হোক অথবা নাস্তিকের চেয়েও নাস্তিক হোক — দুইয়ের জন্যই ভগবানের সেই একই বিধান, সব সমান। এক ব্যক্তি বড় আস্তিক, ভগবানকে খুব মানে এবং তাঁকে লাভ করার জন্য সাধন-ভজন করে থাকে। আর একজন লোক এমন নাস্তিক, যে দুনিয়া থেকে ভগবানের নাম-গন্ধও তুলে দিতে চায়, ভগবানকে মানার ফলে এবং ভগবানের দরুণই দুনিয়ায় যত দুঃখ পাচ্ছে সবাই, ভগবান নামে কোন বস্তুই নেই— এই হল তাদের মনের ভাব এবং সেইভাবেই তারা প্রচারও করে থাকে। এমন যে ঘোর নাস্তিক, সেই ব্যক্তিরও পিপাসা মিটিয়ে থাকে জল, আবার সেই জলই আস্তিকের চেয়েও যে আস্তিক, তারও পিপাসা মিটায়। জলের মধ্যে এরকম ভেদ বা পার্থক্য নেই যে সে আস্তিকের পিপাসাই ঠিকমত নিবারণ করবে, নাস্তিকের নয়। সে সমানভাবে সকলেরই পিপাসা মিটিয়ে থাকে। ঠিক তেমনিই সূর্য সমানভাবে সকলকে আলো দিয়ে থাকেন, বায়ু বা হাওয়া সমানভাবে সবাইকে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে দেন, পৃথিবীও সমান রীতিতে সবাইকে থাকবার স্থান দিয়ে থাকেন। এইভাবে,

ভগবানের রচিত বা সৃষ্ট প্রত্যেক বস্তুই সবাই সমানভাবে প্রাপ্ত হয়, একইভাবে মিলে যায় সবার কাছে সব কিছু।

সমতার মানে এই নয় যে সমানভাবে সকলের সঙ্গে আহার-বিহার-বিবাহাদি সম্পাদন করা। আচার-আচরণে সমতা তো মহাপতনকারী। সমান ব্যবহার হল যমরাজের, মৃত্যুরই অপর নাম, কারণ তার ব্যবহারে কোন বৈষম্য ঘটে না। মহাত্মাই হোক, গৃহস্থই হোক অথবা সাধুই হোক বা পশুই হোক কিম্বা দেবতাই হোক, মৃত্যু সকলের সমানভাবে হয়ে থাকে। এই কারণেই যমরাজকে 'সমবর্তী' অর্থাৎ সমান ব্যবহারকারী বলা হয়, যেমন 'অমরকোষে' সংস্কৃত অভিধানে যমের পর্যায়বাচক শব্দের মধ্যে বলা হয়েছে—'সমবর্তী পরেতরাট্' (অমরকোষ ১।১।৫৮)। অতএব যারা সমান ব্যবহার করে থাকেন তাঁরাও যমরাজ।

পশুদের মধ্যেও সমান ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন কুকুর, সে ব্রাহ্মণের রান্নাঘরে ঢুকলে তো পা ধুয়ে যায় না। ব্রাহ্মণেরই রন্ধনশালা হোক অথবা হরিজনের, সে তো যেমনকার তেমন তার মধ্যে ঢুকে যায়, কারণ এই হল তার সমতা। কিন্তু মানুষের পক্ষে এ সমতা নয়, বরং মহা অপরাধ। তার পক্ষে সমতা হল এই যে, অন্যের দুঃখ কেমন করে দূর হয়, অপরের কেমন করে সুখ হয়, কিভাবে সে আরাম পায় । এইরকম সমতা রক্ষা করে ব্যবহার করার সময়ে মনে পবিত্রতা, নির্মলতা রক্ষা করা কর্তব্য। ব্যবহারে পবিত্রতা রাখলে অন্তরও পবিত্র, নির্মল হয়ে যায়। কিন্তু ব্যবহারে অপবিত্রতা রাখলে, খাওয়া-দাওয়া শুধু এক করলে অন্তরে অপবিত্রতাই আসে, যার ফলে অশান্তির বৃদ্ধি ঘটে। কেবল বাইরের ব্যবহারে সাম্য রক্ষা করা শাস্ত্র ও মর্যাদার বিরোধী। এর ফলে সমাজে সংঘর্ষ দেখা দেয় বা উৎপন্ন হয়।

বর্ণ বা জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ উঁচুতে আর শূদ্র নীচে, এমন শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত নয়। ব্রাহ্মণ উপদেশের দ্বারা, ক্ষত্রিয় রক্ষা দ্বারা, বৈশ্য ধনসম্পত্তি দ্বারা বা প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের দ্বারা এবং শূদ্র আপন দেহের দ্বারা পরিশ্রম করে সব বর্ণের সেবা করবে—এই হল শাস্ত্রের নির্দেশ। এর মানে এই নয় যে

অন্যেরা আপন কর্তব্য-পালনে যেন পরিশ্রম না করে, বরং আপন কর্তব্য পালনে সমানভাবে সবাই যেন পরিশ্রম করে। যার কাছে যেমন শক্তি, বিদ্যা বা জ্ঞান, বস্তু বা জিনিসপত্র, কলা বা কৌশলাদি আছে, সে তার দ্বারাই যেন সেবা করে, তাদের কাজে সহায়ক হয়। কিন্তু চার বর্ণের সেবা করতে গিয়ে যেন কোন ভেদভাব না পোষণ করে বা দেখায়।

আজকাল বর্ণাশ্রম ঘুচিয়ে দিয়ে, জাতপাত তুলে দিয়ে কেবল পার্টিবাজি, দলাদলি চলছে। আজ বর্ণাশ্রমের মধ্যে তত লড়াই নেই, যত লড়াই পার্টিবাজির মধ্যে, —এ হল প্রত্যক্ষ। আগেকার দিনে মানুষ চার বর্ণ ও আশ্রমের মর্যাদা অনুসারে চলতেন এবং সুখে শান্তিতে থাকতেন। আজ বর্ণাশ্রমের মর্যাদাকে ঘুচিয়ে ফেলে অনেক পার্টি বা দল তৈরী করা হচ্ছে, যার ফলে সংঘর্ষ প্রোৎসাহন পাচ্ছে। গ্রামসমূহে সব লোকের পক্ষে জল পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। যাদের অধিকারে বা দখলে কুয়ো আছে, তারা বলছেন, 'তুমি তো ঐ পার্টিকে ভোট দিয়েছ, তাই তুমি এখান থেকে জল ভরতে পাবে না।' মা, বাপ, ছেলে—তিনজন আলাদা-আলাদা পার্টিকে ভোট দেন এবং বাড়ীতে পরস্পর লড়াই-ঝগড়া করেন। ভিতরে, আপন অন্তরে এই শত্রুতা কায়েম হয়ে বাসা বেঁধেছে যে তুমি ঐ পার্টির আর আমি এই পার্টির। কী মহা অনর্থ হয়ে চলেছে সর্বত্র !

যদি সমতা আনতে হয়, তা হলে দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ অন্য জন যে কোন বর্ণ, আশ্রম, ধর্ম, সম্প্রদায় বা মতের লোকই হোক না কেন তাকে সুখ দিতে হবে, তার দুঃখ দূর করতে হবে এবং তার বাস্তবিক হিত বা মঙ্গল সাধন করতে হবে। তাদের মধ্যে এরকম ভেদ বা বৈষম্য থাকতেই পারে যে আপনি 'রাম-রাম' করেন, আমি 'হরি-হরি' বলি, আপনি বৈষ্ণব, আমি শৈব, আপনি মুসলমান, আমি হিন্দু ইত্যাদি। কিন্তু এতে কোনো বাধা আসে না। বাধা আসে তখনই যখন এই ভাব এসে বাসা বাঁধে মনের মধ্যে যে উনি আমার দলের বা পার্টির নন, অতএব ওঁর দুঃখ হতে থাক কিন্তু আমার বা আমার দলের লোকের যেন সুখই লাভ হয়। এইরকম মনোভাব মহা পতন

বা অধোগতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এইজন্য কখনও কোন বর্ণাদির মানুষদের, যে কোন জাতির লোকদের যদি দুঃখকষ্ট হয় তা হলে তাদের হিত বা মঙ্গলের চিন্তা সমানভাবেই হওয়া উচিত এবং তাদের সুখ হলে তা থেকে প্রসন্নতা বা আনন্দ তেমনি সমানভাবেই হওয়া কর্তব্য। যেমন, ব্রাহ্মণ আর হরিজনদের মধ্যে সংঘর্ষ হল। তাতে হরিজনদের হার এবং ব্রাহ্মণদের জয় হলে পর আমার মন যদি খুশি হয় অথবা ব্রাহ্মণদের হার এবং হরিজনদের জয় হলে আমার মনে যদি দুঃখ হয়, তাহলে এ হল বিষমতা বা বৈষম্য, যা একান্ত হানিকারক, ক্ষতিকারক। ব্রাহ্মণ এবং হরিজন —এই দুইয়ের প্রতিই আমার মনে সমান হিত বা মঙ্গলভাবনা হওয়া উচিত। কারুর অহিত বা অমঙ্গল যেন আমার সহ্য না হয়। যে কারুর দুঃখ আমার হৃদয়ে সমানভাবে যেন আঘাত করে। যদি ব্রাহ্মণ দুঃখে পড়ে থাকেন তো তাঁকে সুখে পৌঁছে দেব আর যদি হরিজন দুঃখী হয়ে থাকেন, তাঁর সুখ বিধান করব না—এমন পক্ষপাত যেন কখনও না হয় বরং হরিজনদের সুখ এনে দেওয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা কর্তব্য। আবার হরিজনদের সুখ পৌঁছে দেবার চেষ্টা করতে গিয়েও যেন ব্রাহ্মণদের দুঃখকে উপেক্ষা করা না হয়। এইভাবে যে কোন বর্ণ বা আশ্রম, ধর্ম, সম্প্রদায় প্রভৃতি নিয়ে কোনও পক্ষপাত হওয়া উচিত নয়। সকলের প্রতি সমানভাবে একই রীতিতে মঙ্গল বা হিতসাধক ব্যবহার হওয়া চাই।

যদি নিম্নবর্গ বা নীচু শ্রেণীর কেউ হয়, এবং তাকে আমি উপরে তুলতে চাই, তা হলে সেই বর্গের বা শ্রেণীর লোকদের ভাব এবং আচরণকে শুদ্ধ করে তোলা কর্তব্য। যদি তাদের কাছে জিনিসের বা উপকরণের কম্‌তি থাকে, তবে তা পূরণ করে দেওয়া উচিত ; তাদের সাহায্য করা উচিত। কিন্তু উল্‌টে তাদের মনে অন্য গোষ্ঠী বা শ্রেণীর প্রতি ঈর্ষা ও দ্বেষ জাগিয়ে তুলে তাদের মনকে সেইভাবে ভরে দেওয়া অত্যন্ত অহিতকর, বিনাশকারী হয়ে থাকে এবং ইহলোক-পরলোকে পতন ঘটায়। যদি এইরকম মনোভাব ব্রাহ্মণদের মধ্যে থাকে, তবে তাঁদেরও পতন ঘটবে আর যদি হরিজনদের

মধ্যে থাকে তো তাঁদেরও পতন অনিবার্য। **উত্থান বা উন্নতি তো কেবল সদ্ভাব, সদ্গুণ এবং সদাচরণের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।**

খাওয়া-পরা-থাকা ইত্যাদি জীবনযাপনের মূল উপকরণ বা বস্তুসমূহের কম্‌তি বা ঘাটতি আছে যাদের মধ্যে, তাদের বিশেষ করে ঐসব জিনিস দেওয়া উচিত, তা তারা যে কোন বর্ণ, আশ্রম, ধর্ম, সম্প্রদায়াদির লোকই হোক্ না কেন। সকলের জীবন-যাপন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে হওয়া চাই। সবাই যেন সুখী থাকে, সবাই যেন নীরোগ হয়, সবাইয়ের যেন মঙ্গল হয়, কারুর কখনও কিঞ্চিন্মাত্রও যেন দুঃখ না হয়—

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্‌ভবেৎ॥

এইভাব রেখে যথাযোগ্য ব্যবহার করার নামই সমতা, যা সমস্ত মানুষের পক্ষে হিতকর।

গীতায় ভগবান বলেছেন—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ (গীতা ৫।১৮)

অর্থাৎ 'জ্ঞানী মহাপুরুষ বিদ্যা-বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে তথা গাভী, হস্তি এবং কুকুরেও সমরূপ পরমাত্মার দ্রষ্টা হয়ে থাকেন।'

ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডালে, তথা গাভী, হস্তি এবং কুকুরে ব্যবহারে অর্থাৎ কার্যতঃ বিষমতা অনিবার্য। এদের মধ্যে সমানভাবে ব্যবহার করতে শাস্ত্রও বলে না, উচিতও নয় এবং করতেও পারা যায় না। যেমন পূজন অর্থাৎ সম্মানদান বিদ্যাবিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণেরই হতে পারে, চণ্ডালের নয়। দুধ গাভীরই পান করা যায়, কুকুরের নয়। পৃষ্ঠে আরোহণ করে সওয়ার হওয়া যায় হাতিরই, কুকুরের নয়। এই পাঁচটি প্রাণীর উদাহরণ দিয়ে ভগবান বলতে গেলে এই কথাটি বোঝাতে চাইছেন যে এদের মধ্যে ব্যবহারের সমতা সম্ভব না হওয়া সত্ত্বেও তত্ত্বতঃ সকলের মধ্যে একই পরমাত্মতত্ত্ব পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। মহাপুরুষদের দৃষ্টি সেই পরমাত্মতত্ত্বের উপরই সদা

সর্বদা থাকে। তাই তাঁদের দৃষ্টি কখনও বিষম অর্থাৎ বৈষম্যযুক্ত হয় না।

এখানে একটি শঙ্কা বা সন্দেহ জাগতে পারে যে দৃষ্টি বিষম হলে তবেই তো ব্যবহারে ভিন্নতা বা ভেদ হবে ? এর সমাধান হল এই যে, নিজের দেহের সব অঙ্গে—মাথা, পা, হাত ইত্যাদিতে আমার দৃষ্টি অর্থাৎ আপন বলে বোধ এবং তাদের মঙ্গলের ভাবনা অর্থাৎ সবগুলির ভালো থাকার চিন্তা সমানই থাকে, তা সত্ত্বেও তাদের ব্যবহার করার ব্যাপারে ভেদ করে থাকি—যেমন কারুর গায়ে পা লেগে গেলে ক্ষমা ভিক্ষা করি কিন্তু হাত লেগে গেলে ক্ষমা চাই না। প্রণাম করে থাকি মাথা ও হাত দিয়ে, পা দিয়ে নয়। নিম্নাঙ্গে হাত লাগলে হাত ধুয়ে থাকি, হাতে হাত লাগলে ধুই না। শুধু তাই নয়, এক হাতেরই আঙুলদের মধ্যেও ব্যবহারে ভেদ থাকে। কাউকে তর্জনী দেখানো এবং বুড়ো আঙ্গুল দেখানোর পার্থক্য তো সবাই জানেন। এইভাবে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহারে তো ভেদ হয়ে থাকে কিন্তু আত্মীয়তাতে অর্থাৎ তাদের আপন বলে বোধ করার ক্ষেত্রে, নিজেরই অঙ্গ বলে উপলব্ধির ক্ষেত্রে কোন ভেদ হয় না। সেইকারণেই দেহের যে কোন পীড়িত অঙ্গকেই উপেক্ষা করা চলে না । ব্যবহার-ভেদ হওয়া সত্ত্বেও পীড়া বা কষ্ট মেটানোর ক্ষেত্রে আমরা সমানভাবেই সব অঙ্গকে দেখে থাকি। সমানভাবেই তাদের সঙ্গে ব্যবহার করে থাকি। শরীরের সব অঙ্গের সুখ-দুঃখে আমাদের একই ভাব হয়ে থাকে।

ঠিক তেমনি প্রাণিগণের খাওয়া-দাওয়া, গুণ, আচরণ, জাতি ইত্যাদির ভিন্নতা হওয়ার দরুণ তাদের সঙ্গে জ্ঞানী মহাপুরুষদের ব্যবহারেও ভিন্নতা দেখা যায় এবং তা হওয়াই উচিত। কিন্তু সেই সব প্রাণিসমূহে একই পরমাত্মতত্ত্ব পরিপূর্ণ হওয়ার দরুণ মহাপুরুষদের দৃষ্টিতে ভেদ বা ভিন্নতা ঘটে না। সেই প্রাণীদের প্রতি মহাপুরুষদের আত্মীয়তাবোধ, প্রেম, দয়া, মঙ্গলভাবনা ইত্যাদি ভাবের মধ্যে কোনও পার্থক্য ঘটে না, আলাদা ভাব থাকে না। তাঁদের অন্তঃকরণে বা মনে রাগ, দ্বেষ, মমতা, আসক্তি, অভিমান, পক্ষপাত, বিষমতা প্রভৃতির সর্বথা অভাব হয়ে থাকে। যেমন

আপন দেহের কোন অঙ্গের দুঃখ দূর করার চেষ্টা স্বভাবতই হয়ে থাকে, তেমনি জানতে পারলে অন্য প্রাণীর দুঃখ দূর করতে এবং তাদের সুখ এনে দিতে তাঁদের চেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিয়ে থাকে। সেই কারণেই ভগবান এখানে মহাপুরুষদের 'সমদর্শী' বলেছেন, 'সমবর্তী', সমান ব্যবহারকারী বলেন নি। গীতায় অন্যান্য জায়গাতেও সমানভাবে দেখা অথবা সমবুদ্ধির কথা বলা হয়েছে, যেমন **'সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে'** (৬।৯), **'সর্বত্র সমদর্শনঃ'** (৬।২৯), **'আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি'** (৬।৩২), **'সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ'** (১২।৪), **'সমং সর্বেষু ভূতেষু......যঃ পশ্যতি স পশ্যতি'** (১৩।২৭) এবং **'সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র'** (১৩।২৮)।

ভগবান শঙ্করাচার্যও তাই বলছেন—

'ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কুত্রচিৎ' (তত্ত্বোপদেশ)

অর্থাৎ ভাবে সর্বদা অদ্বৈত হওয়া চাই, ক্রিয়া অর্থাৎ ব্যবহারে কোথাও নয়।

চোখের এবং পেটের রোগ

সব মানুষেরই দুরকমের রোগ আছে— চোখের রোগ আর পেটের রোগ। চোখের রোগ কী ?

এই দুনিয়ায় এক আঁধার, সবার চোখে যা আছে ছেয়ে।
যার দরুণ যায় না দেখা কিছুই, কে-ই বা আমি, এলাম কোথা হতে ?
কোন্ দিকে যেতে হবে আমায় ? কাকে দেখে আমার জাগলো লালসা ?
কে আছে মালিক এই দুনিয়ার, কে-ই বা রচেছে এই মায়া ?

আর পেটের রোগ কী ?

এই দুনিয়ার আছে একটি কূয়ো, যার পার কেউ না পায়।
যেটিকে ভরার জন্য সব প্রাণী দিক্-দিগন্তরে কেবলি ধায়॥
দীনহীন হয়ে পড়ল ঘরে গিয়ে, সেবা করে করে মরে যায়।
ভজন-ধ্যান-চিন্তন ঈশ্বরের, সেই কারণে সব ভুলে যায়॥

এই বিষয়ে একটি গল্প আছে। একজন ছিলেন ডাক্তার। তাঁর কাছে এক রোগী গিয়ে উপস্থিত হল। সে ডাক্তারকে বলল যে, আমার চোখে বড় কষ্ট হচ্ছে, আবার পেটেও বড় পীড়া। ডাক্তার তাকে শুইয়ে দিয়ে তার পেট দেখল এবং চোখও দেখল। ইতিমধ্যে আর এক রোগী এসে হাজির। সেও বলল যে আমার চোখে ও পেটে বড় কষ্ট হচ্ছে। ডাক্তার ভাবতে লাগলেন এ আবার কী হাওয়া এল, সকলেরই একই অসুখ ! ডাক্তার দুজনকেই আলাদা-আলাদা ওষুধ লিখে দিলেন এবং বলে দিলেন যে কম্পাউন্ডারের কাছে ওষুধ নিয়ে নাও। কম্পাউন্ডার দুজনকেই ওষুধের দুটি দুটি পুরিয়া তৈরী করে দিয়ে দিল। একটি চোখের আর অন্যটি পেটের জন্য। ডাক্তার বুঝিয়ে দিলেন যে দেখো, এ হল চোখে দেবার পুরিয়া—এটি রাতে শোবার সময় চোখে ফেলে দিও এবং বারবার চোখের পলক ফেলো, যাতে চোখ

থেকে গরম গরম জল বেরিয়ে যায়। তারপর শুয়ে পোড়ো। এতেই চোখ ঠিক হয়ে যাবে। আর এই দ্বিতীয় পুরিয়াটা পেটের জন্য। এটি এক পোয়া জলে ফেলে দিয়ে উনুনের উপর রেখে দিও। ফোটার পরে যখন এক ছটাক পরিমাণ রয়ে যাবে, তখন সেই কাথটি ছেঁকে পান করে ফেলো। এতে পেট ঠিক হয়ে যাবে এবং পায়খানা লাগলে অর্থাৎ পায়খানা হয়ে গেলে চোখের পক্ষেও লাভ হবে।

দুই রোগীই ওষুধ নিয়ে চলে গেল। বাড়ী গিয়ে একজন রোগী তো ঠিক তেমনিই সব করল যেমন ডাক্তার বলেছিলেন। চোখের ওষুধ চোখে এবং পেটের ওষুধ পেটে ঢেলে দিল। কিন্তু দ্বিতীয় রোগীটি পুরিয়া উল্‌টে ফেলল। সে পেটের ওষুধ চোখে এবং চোখের ওষুধ পেটে ঢেলে বসল। চোখে তো সামান্য একটু ময়লা বা নোংরা কিছু পড়লেই পীড়া জন্মায়, আর সে পেটের ওষুধের পুরিয়াটি শুদ্ধ চোখে ঢেলে বসে আছে। তার ফলে চোখের জ্বালা-যন্ত্রণা বেড়ে গেল। চোখের ওষুধ হয় ঠাণ্ডা, তা পেটে চলে যাওয়ার ফলে পেটের কষ্টও গেল বেড়ে। তখন সে ডাক্তারকে গালমন্দ করতে লাগল মনে মনে এই বলে—'তোর বাপকে কি আমি মেরেছিলাম ? সে তো নিজের মরণ ঘনিয়ে এসেছিল বলেই মরেছে। তাহলে তুই আমার থেকে কিসের বদ্‌লা নিলি ?'

পরের দিন ডাক্তারখানা খুলতেই সব চেয়ে আগে সে গিয়ে বসল। ডাক্তার এলেন ও ডাক্তারখানা খোলার পর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'বলো, কেমন আছ ?'

সে বলল : 'কিসে কেমন আছি ?'

ডাক্তার বললেন : 'আরে, হয়েছেটা কী ?'

সে বলল : 'হবে আবার কী ? যা তুমি করেছ, তাই হয়েছে।'

ডাক্তার বললেন : 'আমি কী করেছি ?'

সে বলল : 'এমন ওষুধ দিয়ে দিয়েছ যে আমার চোখের যন্ত্রণাও বেড়ে গিয়েছে আবার পেটের যন্ত্রণাও তেমনি বেড়েছে। সোজা বলে দিলেই

পারতে যে আমি ওষুধ দিই না। আমার কাছে তো বেশি টাকা পয়সা নেই, তাই আমাকে উল্‌টো ওষুধ দিয়েছ।'

ডাক্তার তখন বললেন : 'ভাই, রোগ বেড়ে গেল কী করে ? কোন কোন লোকের ওষুধে তাড়াতাড়ি কাজ হয়, কারুর বা হয় না, সেটা আপন প্রকৃতি অনুসারে কিন্তু রোগ বেড়ে যাবার তো কারণই নেই।'

সে বলল : 'আমি তো ভুক্তভোগী, আমার রোগ বেড়ে গিয়েছে।' ইতিমধ্যে দ্বিতীয় রোগীটি এসে উপস্থিত। ডাক্তার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'বলো, তুমি কেমন আছ ?' সে বলল : 'ডাক্তারবাবু খুব ভাল আছি। এক-দু'বার পায়খানা হয়ে পেটও ঠিক আছে আর চোখও ঠিক আছে।' এই কথা শুনতেই সেই প্রথম রোগীটি বলল : 'দেখো, এ তো পয়সাওয়ালা লোক, একে ভালো ওষুধ দিয়েছে, আর আমাকে বাজে ওষুধ চালিয়ে দিয়েছে।' ডাক্তার বললেন : 'বাজে কীভাবে দিয়ে দিলাম ? যে ওষুধ ওকে দিয়েছি, ঠিক সেই ওষুধই তোমাকেও দিয়েছি। তোমার পুরিয়া কিরকম ছিল ?' রোগীটি তখন পকেট থেকে সেই গুঁড়ো ওষুধের পুরিয়াটি বার করে ডাক্তারের সামনে ফেলে দিয়ে বলল : 'এই হল সেই পুরিয়া।' ডাক্তার তখন বললেন : 'আর অন্য পুরিয়াটি ?' সে বলল : 'অন্যটি তো ক্বাথ করে খেয়ে ফেলেছি। এই পুরিয়াটি চোখে ঢেলে দিয়েছিলাম, ওষুধ বেশি ছিল, তাই এইটুকু বেঁচে গিয়েছে, থেকে গিয়েছে।' শুনতেই ডাক্তার বললেন : 'একে এখান থেকে বার করে দাও। উল্‌টো ওষুধ খাবে নিজে আর বলবার বেলায় বলবে, তুমি আমার রোগ বাড়িয়ে দিয়েছ !'

ঠিক এমনিভাবেই আমরা সবাই রোগী। আমাদের চোখের রোগ কী ? আসল কথা আমাদের নজরে পড়ে না। নিজে তো জানিই না, অন্যকেও মানি না। যারা কম জানে, তাদের কথাই পুরো মেনে নিয়ে বলি, ব্যস্‌ এই ঠিক আছে। আর পেটের রোগ কী ? পেট কখনও ভরেই না। গরীবেরও পেট ভরে না, লাখপতি-ক্রোড়পতিরও পেট ভরে না। যতই কিছু মিলুক তবুও বলতেই থাকে, কী করি ? কাজ চলে না।

এই দুরকম রোগীর জন্য ভগবান আমাদের দুটি পুরিয়া দিয়েছেন— প্রারব্ধ এবং পুরুষার্থ। চোখের অসুখের জন্য হল 'পুরুষার্থ' এবং পেটের রোগের জন্য 'প্রারব্ধ'। যদি পুরুষার্থ অর্থাৎ নিজে চেষ্টা করি, সৎসঙ্গ, স্বাধ্যায়, বিবেক-বিচার করি, তা হলে চোখের রোগ দূর হবে। আর আপন কর্তব্য-পালন করতে থেকে প্রারব্ধের উপর বিশ্বাস রেখে চলব যে, যা আমার ভাগ্যে লেখা আছে, তাই মিলবে, তা হলে পেটের রোগ দূর হবে। শাস্ত্রেও তাই বলা হয়েছে—

যদভাবি ন তদ্‌ভাবি ভাবি চেন্ন তদন্যথা।
ইতি চিন্তাবিষঘ্নোঽয়মগদঃ কিং ন পীয়তে॥

অর্থাৎ যেটা না হবার তা কখনই হবে না আর যেটা হবার, তা হবেই হবে। চিন্তারূপী বিষকে বিনাশ করার এমন ওষুধ কেন পান করে না সকলে ?

প্রারব্ধ পহলে রচা, পীছে রচা শরীর।
তুলসী চিন্তা ক্যোঁ করে, ভজ লে শ্রীরঘুবীর॥
হোইহি সোই জো রাম রচি রাখা। কো করি তর্ক বঢ়াবৈ সাখা॥
(শ্রীরামচরিতমানস ৫২।৪)

প্রারব্ধ তাই শোক-চিন্তা দূর করার জন্যই, অলস-অকর্মণ্য করার জন্য নয়। যেমন ছেলে যদি অসুস্থ হয় তো আপন সামর্থ্য অনুসারে তার ভালোমত চিকিৎসা করাতে করাতে যদি সে মারা যায়, তা হলে অন্তত এই নিয়ে চিন্তা, শোক, দুঃখ হবে না যে আমার তরফ থেকে তার চিকিৎসায় কোন ত্রুটি বা ঘাটতি করেছি। ছেলে তো প্রারব্ধ অনুসারেই মারা যাবে কিন্তু নিজের পুরুষার্থে বা প্রচেষ্টায় যদি ঘাটতি হয়, তা হলে চিন্তা, শোক, দুঃখ হবে যে আমি আমার কর্তব্য ঠিকমত পালন করিনি। এই কারণে যে 'করাতে সাবধান' এবং 'হওয়াতে প্রসন্ন' বা খুশি থাকতে পারে, তার চোখের রোগও ঠিক হয়ে যায় এবং পেটের রোগও। কিন্তু যে পুরিয়া উল্‌টে দেয় অর্থাৎ চোখের রোগের জন্য প্রারব্ধ আর পেটের রোগের জন্য পুরুষার্থ

লাগিয়ে দেয়, তার এই দুই রোগই বেড়ে যায়। সেইরকম লোকদের যদি সৎসঙ্গ-স্বাধ্যায়-ভজন-ধ্যান করতে বলা যায়, তা হলে তাঁরা বলেন : 'কী করে করি বলুন মশাই ! আমার ভাগ্যেই নেই'। প্রারব্ধে প্রাপ্য অর্থাৎ ভাগ্যে লভ্য ধনের জন্য এদিকে রাতদিন পুরুষার্থে, সব রকম প্রচেষ্টায় লেগে থাকেন। সারা পুরুষার্থ পেটের জন্যই লাগিয়ে দেন, আর চোখের জন্য অর্থাৎ দৃষ্টি-উন্মীলনের জন্য কিছু করেনই না। যদি তাঁদের ভগবানের নাম নিতে বা নাম করতে বলো তো তখন বলেন যে, নাম কি করে নেব, মুখে যে একশো মনের তালা লেগে আছে ! নাম দেওয়া, নাম করা আমার ভাগ্যে লেখাই নেই। ভগবানের এমনই মরজি, আমি কী করব বলো ? আমার কী দোষ ?

অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রাপ্ত হওয়া 'প্রারব্ধে'র অধীন আর প্রাপ্ত পরিস্থিতির সদুপযোগ, সদ্ব্যবহার করা 'পুরুষার্থে'র অধীন। এইজন্য কর্তব্য-পালন, সৎসঙ্গ-স্বাধ্যায়, ভজন-ধ্যানাদি করার ব্যাপারে মানুষ স্বাধীন, স্বতন্ত্র কিন্তু অর্থ উপার্জনে সে স্বাধীন নয়। মানুষ এইরকম নিয়ম বা ব্রত তো গ্রহণ করতে পারে যে আমি রোজ এত মালা জপ করব, এতক্ষণ স্বাধ্যায়, পূজাপাঠ করব, কিন্তু এমন নিয়ম সে করতে পারে না যে রোজ আমি এত টাকা রোজগার করব। তার কারণ হল ভজন-ধ্যানাদি করা হল পুরুষার্থের অধীন আর অর্থ উপার্জন প্রারব্ধ বা দৈবের অর্থাৎ কপালের অধীন। কিন্তু আমরা করি কী না—যেখানে পুরুষার্থ লাগানো, নিজের চেষ্টা করা উচিত, সেখানে প্রারব্ধকে লাগিয়ে দিই অর্থাৎ তার উপর সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকি, আর যেখানে প্রারব্ধ লাগানো উচিত, সেখানে পুরুষার্থ লাগিয়ে দিই। ফলে, দুই রোগেরই বৃদ্ধি ঘটল। পেটের রোগ বেড়ে যাওয়ার ফলে জীবন-যাপনের খরচ অনেক বেড়ে গেল। লেখা-পড়ায়, খাওয়া-দাওয়ায় আস্বাদ ও শখ মেটানোয়, থাকার ব্যবস্থায় খরচ বেড়ে গেল, আর বলে থাকি যে 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' তো উঁচু হওয়া চাই। সারা পুরুষার্থ বা প্রচেষ্টা 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' উঁচু করাতে, পেট ভরানোতেই

লাগিয়ে দিলাম, আর চোখে কিছু নজরই এল না যে ভগবান কী ? সংসার কী ? আমি কে ? আমার কি করা উচিত ? রাতদিন কেবল 'হায় পয়সা, হায় পয়সা' করছি। যদি 'হায় ভগবান ! হায় ভগবান !' করতাম, তা হলে তো নিষ্কৃতি বা মুক্তিই পেয়ে যেতাম। যেরকম চেষ্টা যত্ন করি, সুযোগ খুঁজি অর্থ উপার্জনে, সেইরকমভাবে যদি সাধনা করতাম তা হলে তো কল্যাণ লাভ হয়ে যেত। কিন্তু হায় ! সাধকের এমনই দশা যে রোজকার পূজা-অর্চা যদি কোনমতো সম্পূর্ণ হল তখন ভাবে যে আজকের আপদ তো মিটল ! নাম-জপ সম্পূর্ণ হল তো যেন জেল থেকে ছাড়া পাওয়া গেল ! আর এদিকে দোকানে রোজ একশো টাকা রোজগার হয় এবং কোনদিন যদি সকালের মধ্যেই ঐ একশো টাকা রোজগার হয়ে যায়, তবুও সারাদিনই দোকান খুলে বসে থাকব। কিন্তু জপ যদি হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে মালার থলিটি গুটিয়ে তুলে রেখে দেব !

এটা কী ব্যাপার ? এই হল উল্টো পুরিয়া সেবন করা। এইজন্য যা **মিলেছে, তাতে সন্তুষ্ট থাকা। আর যা না মিলেছে, তার কামনা না করা। আপন কর্তব্য তৎপরতার সঙ্গে পালন করা। অপরের সেবা করা। আর ভগবানের ভজন-স্মরণ, সৎসঙ্গ, স্বাধ্যায় করা।** এইগুলি করলে চোখের রোগও সেরে যাবে, পেটের রোগও দূর হবে।